আমার স্কুল • খুদে প্রতিভা • আমার ইচ্ছেমতো • আমার বই

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬

আনন্দমেলা

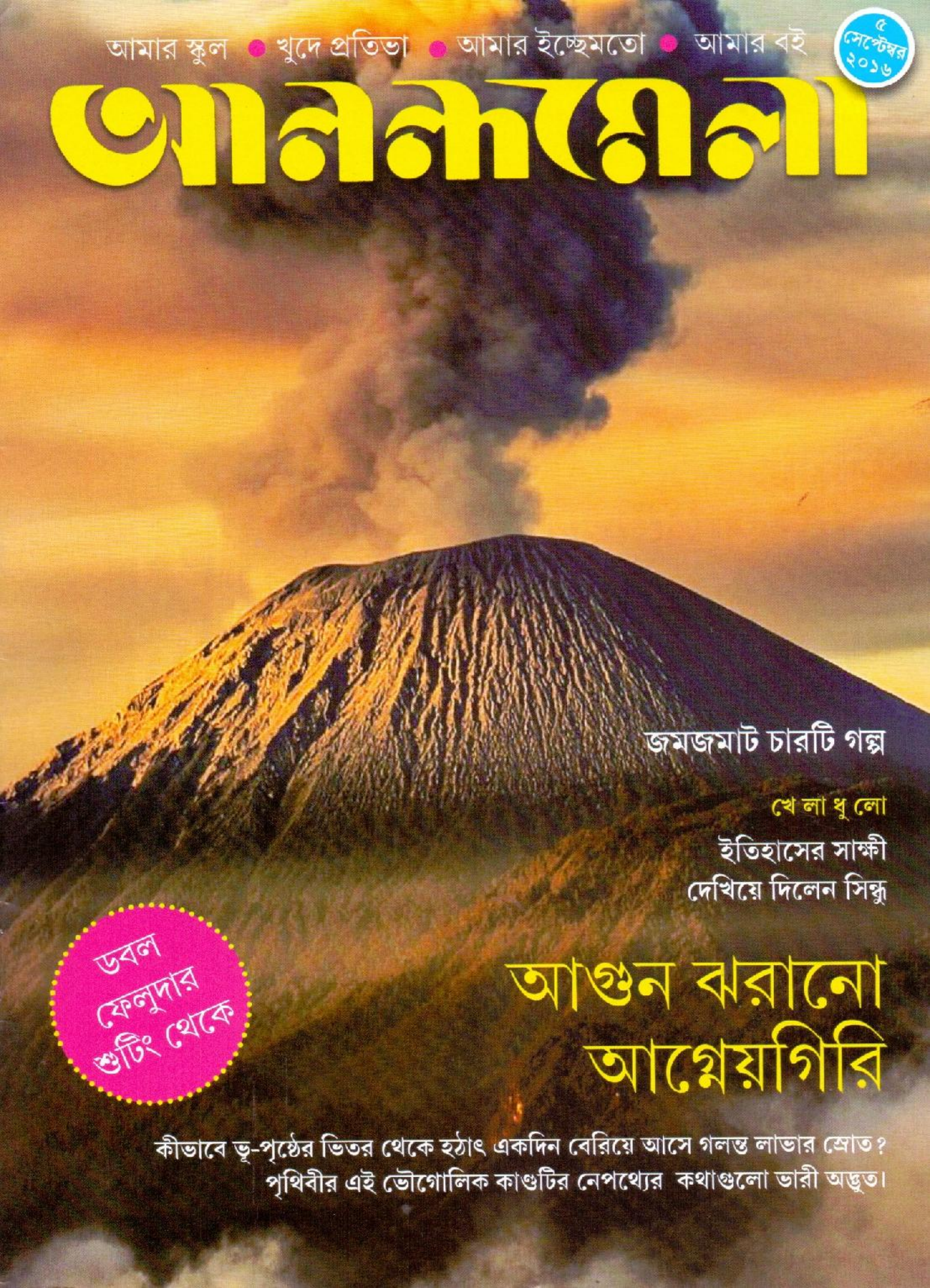

জমজমাট চারটি গল্প

খেলাধুলো

ইতিহাসের সাক্ষী দেখিয়ে দিলেন সিন্ধু

ডবল ফেলুদার শুটিং থেকে

আগুন ঝরানো আগ্নেয়গিরি

কীভাবে ভূ-পৃষ্ঠের ভিতর থেকে হঠাৎ একদিন বেরিয়ে আসে গলন্ত লাভার স্রোত? পৃথিবীর এই ভৌগোলিক কাণ্ডটির নেপথ্যের কথাগুলো ভারী অদ্ভুত।

Dabur

দুবার ব্রাশ করার পরেও দাঁতে ব্যাথা? আমার নেই। আর আপনার?

ডাবর রেড পেস্টে আছে ক্যালশিয়াম আর মিনারেল্স-এর সাথে লবঙ্গ, পুদিনা আর সুঁঠীর মত 13টা আয়ূর্বেদিক উপাদান যা দাঁতকে রাখে স্ট্রং আর প্রবলেম্‌সকে রাখে অনেক দূরে।

প্রবলেম্‌সকে রাখে অনেক দূরে

লড়াই করে দাঁতের সমস্যার সাথে, যেমন:

■ মাড়ি থেকে রক্তপাত ■ ক্যাভিটীজ ■ দাঁতে ব্যথা* ■ টার্টার ■ প্লাক ■ দাঁতে ক্ষয় ■ নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ

আরও বিশদে জানার জন্যে লগ অন করুন www.daburdentalcare.comএ অথবা কল করুন +91-120-4181100.

আপনি আমাদের মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় - ডাবর ইন্ডিয়া লিমিটেড, পি.ও. বক্স নং: 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ - 201010, উত্তর প্রদেশ

পাওয়া যাচ্ছে: amazon.in | snapdeal

*দাঁতের ব্যথা: ক্যাভিটীজ এবং মাড়ি থেকে রক্ত পড়ার জন্যে ব্যথা হয়েছে।

ভি কে সি প্রাইড
INDIA'S NO.1 PU FOOTWEAR
এখন হাঁটুন অনেক পথ...
তবে সামলে রাখবেন
Art No. 1590
MRP : ₹ 299.00
Art No. 682
MRP : ₹ 289.00
Art No. 3144
MRP : ₹ 329.00
VKC pride
For the whole family
* MRP mentioned is per 2N (1 pair) inclusive of all taxes.
Veekesy Plastomers India Pvt. Ltd., Taratala, Kolkata,
West Bengal - 700 088. Ph: 0869 7730363. www.vkcgroup.com

আরো বংলা পত্রিকার
পিডিএফ ফাইল
ডাউনলোডের জন্য
নিচের লিংকে ক্লিক করুন
www.allmagazine.in

আ ন ন্দ - র ব ই

আনন্দমেলার নানাস্বাদের গল্পসংকলন

পৌলোমী সেনগুপ্ত সম্পাদিত

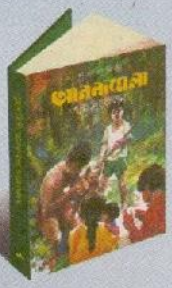

পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা গল্পসংকলন ৪৫০.০০

পুজোর উৎসবে শরতের সোনালি রোদ আর একটানা ছুটির সঙ্গে মিশে থাকে পুজোর সাহিত্য। শিশু ও কিশোররা সারা বছর উন্মুখ হয়ে থাকে আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর জন্য। পূজাবার্ষিকীতে গত তিরিশ বছরে (১৯৭১-২০০০) প্রকাশিত নামী লেখকদের ৫০টি মনমাতানো গল্প নিয়ে হাজির এই সংকলন।

আনন্দমেলা গল্পসংকলন ৩৫০.০০

'আনন্দমেলা' পত্রিকা আর বাঙালির শৈশব প্রায় সমার্থক। রোজকার জীবন থেকে মনের গাড়িতে পালিয়ে বেড়ানোর সঙ্গী যেমন হতে পারে আনন্দমেলা, তেমনই বাস্তবকে সঠিক আলোয় বুঝতে পারার পথও দেখাতে পারে। আনন্দমেলা সাধারণ সংখ্যার প্রথম ২৬ বছরের (১৯৭৫ থেকে ২০০০) প্রকাশিত গল্পের ভাণ্ডার থেকে বেছে নেওয়া ৫০টি গল্প নিয়ে এই আনন্দমেলা গল্পসংকলন।

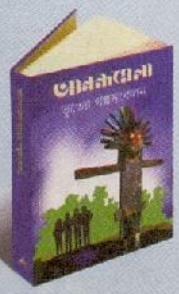

আনন্দমেলা ভূতের গল্পসংকলন ৪০০.০০

ছোটদের প্রিয় পত্রিকা আনন্দমেলা যেন জাদু জানে। ছেলেমেয়েদের মনের খোরাক জোগাতে তার জুড়ি নেই। এবার প্রকাশিত হল রোমাঞ্চকর 'আনন্দমেলা ভূতের গল্পসংকলন'। জনপ্রিয় লেখকদের মনমাতানো গল্পে হাজির হয়েছে বিচিত্র সব ভূত। আনন্দমেলার বরে এবার জবর-জবর ভূতের ঠিকানা ছোটদের হাতের মুঠোয়।

আনন্দমেলা রহস্য গল্পসংকলন ৩০০.০০

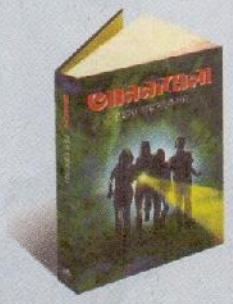

আত্মপ্রকাশের পর থেকেই আনন্দমেলা-র পাতায় পাতায় অনবদ্য সব রহস্যকাহিনির ছড়াছড়ি। সেইসব অসাধারণ সৃষ্টিসম্ভার থেকে কিছু গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল 'আনন্দমেলা রহস্য গল্পসংকলন'। নিঃসন্দেহে একটি রোমাঞ্চকর প্রকাশনা।

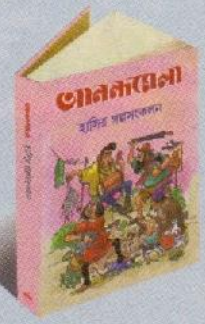

আনন্দমেলা হাসির গল্পসংকলন ৩৫০.০০

আনন্দমেলার হাসি মানেই শৈশবের বাঁধনখোলা হাসি। বড় হয়ে যখন প্রাণখোলা হাসির অভাব বোধ হয়, তখন এই আনন্দমেলার হাসিমজাই পারে টেনশন থেকে বের করে আনতে। তাই এই সংকলনে শুরু থেকে এখনকার দিন পর্যন্ত আনন্দমেলায় প্রকাশিত কয়েকটি হাসির গল্প ধরে রাখার প্রয়াস।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন ২২৪১-৪৩৫২, ২২৪১-৩৪১৭,
ই-মেল ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট www.anandapub.com

আনন্দমেলা

৪২ বর্ষ ৯ সংখ্যা ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ২০ ভাদ্র ১৪২৩

প্রচ্ছদ কাহিনি

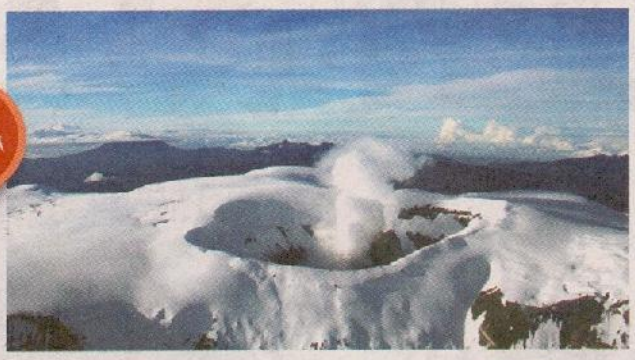

আগুন ঝরানো আগ্নেয়গিরি ৮

বুকের মধ্যে আগুন নিয়ে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আজও পৃথিবীর বুকে জেগে রয়েছে। কবে, কখন তাদের জ্বালামুখ থেকে সেই আগুন বেরিয়ে আসবে, কেউ বলতে পারে না। লিখেছেন **জয়দীপ চক্রবর্তী**

চারটি জমজমাট গল্প

মিতিলের স্বপ্ন দেখা
রম্যাণী গোস্বামী ১৮

মঙ্গলগ্রহের মাটি
গৌতম রায় ২৪

প্যাঁচালো সব রহস্য
চিরন্তনী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০

রূপকথার মতো
শরদিন্দু কর ৩৪

খে লা ধু লো

দেখিয়ে দিলেন সিন্ধু
ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায় ৫৪

ইতিহাসের সাক্ষী
অংশুমিত্রা দত্ত ৫৫

ছোট-ছোট খেলা
চন্দন রুদ্র ৫৬

আনন্দমেলা এবার ওয়েবসাইটে: **www.anandamela.in**

সূচিপত্র

নি য় মি ত বি ভা গ

খুদে প্রতিভা ২২
আমার ইচ্ছেমতো ২৯
আমার কুইজ ৩৩
ফারাক পাও, সুদোকু ৩৮
আমার বন্ধু, আমার ছবি ৩৯
আমার স্কুল ৪৮
যা হয়েছে যা হবে ৫১
আমার বই, লাইফস্টাইল ৫২
শব্দসন্ধান, নিজের হাতে ৫৩
নতুন খেলা ৫৮

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস (পর্ব ৭)
চন্দ্রতালের পরিরা
দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত ৪০

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত
অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর: সিজার বাগচী

দাম: কুড়ি টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

সব্যসাচী, সাহেবকে শট বোঝাচ্ছেন সন্দীপ রায়

ডবল ফেলুদার শুটিং থেকে

ফেলুদার ৫০ বছরে এবার 'ডবল ফেলুদা'। আর ফেলুদার ভূমিকায় ফের সব্যসাচী চক্রবর্তী। তোপসের চরিত্রে সাহেব ভট্টাচার্য। ফেলুদার দুটো গল্প নিয়ে নতুন ছবি করছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। ছবির প্রথমার্ধে দেখানো হবে 'সমাদ্দারের চাবি' আর ইন্টারভ্যালের পরে হবে 'গোলোকধাম রহস্য'।

প্রথম গল্পটির মূল শুটিং হয়েছে বোলপুরে এবং কলকাতার স্টুডিয়োয়। 'গোলোকধাম রহস্য'র খানিক অংশের শুটিং হয়েছে বালিতে। গঙ্গার ধারে সেই বাড়ির ছাদে গিয়ে দেখা গেল ছবির ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যর শুটিং চলছে। যেখানে ফেলুদা ধীরে-ধীরে তোপসেকে বোঝাচ্ছেন কীভাবে টাকা এবং গবেষণার কাগজ চুরি হয়েছে। কেনই বা খুন হয়েছে মিঃ দত্তর। ছাদের নানা অংশে শুটিং চলল। কখনও গঙ্গার দিকে মুখ করে। কখনও বা অন্য দিকে। সব্যসাচী, সাহেব ছাড়াও শট দিলেন ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফেলুদা প্রকাশনার ৫০ বছরে নতুন ছবির শুটিং করছেন সন্দীপ রায়। বালিতে সেই শুটিং দেখে এসে লিখেছেন সিজার বাগচী

প্রতিবারের মতো এবারও খুঁটিনাটির দিকে পরিচালকের চোখ। তার উপর রয়েছেন সব্যসাচী। ফেলুদা হিসেব তাঁর চেয়ে বেশি কোনও বাঙালি অভিনেতা ক্যামেরার সামনে আসেননি। নিজের শট দেওয়ার পাশাপাশি অন্য অভিনেতাদের কিউ দেওয়া থেকে টেকনিশিয়ানদের পাশাপাশি রিফ্লেক্টরের সেলোটেপ লাগানো, সব ব্যাপারেই তিনি জড়িয়ে শুটিংয়ের সঙ্গে।

সন্ধে হতেই ছাদের কাজ শেষ করে বাড়ির ভিতরে শুটিং করতে নামল গোটা ইউনিট। এবার মিঃ সুখওয়ানির ঘরে যাবে ফেলুদা, তোপসে, সুবীরবাবু। তখন একটু ফাঁকা পাওয়া গেল সন্দীপ রায়কে।

এই দুটো গল্প ভাবার পিছনে কি কোনও বিশেষ ভাবনা কাজ করেছে? হাত দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে সন্দীপ রায় বললেন, "এই দুটো গল্পে জটায়ু নেই। সেটা তো বড় ব্যাপার। গল্পদুটো বাবার খুব প্রিয় ছিল। এবং মা-ও এই গল্পের পাণ্ডুলিপিতে কোনও আঁচড় দেননি। ফেলুদা প্রকাশনার ৫০ বছরে এই দুটো ছবিকে খুব যথাযথ মনে হয়েছে।"

সমাদ্দারের চাবি লেখা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। আর গোলোকধাম রহস্য ১৯৮০ সালে। ছবির প্রয়োজনে কাহিনির কি কোনও অদলবদল হয়েছে? "এখনকার সময়ে তো নিয়ে এসেছি। গল্পগুলো এত ভাল যে আমি খুব একটা আঁচড় কাটিনি। গল্পটাকেই অনুসরণ করেছি। তবে প্রয়োজনমতো মোবাইল ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ফেলুদা এখনও মোবাইল ব্যবহার করেনি। গোলোকধাম রহস্য তো খুব সিরিয়াস গল্প। তাই

রিলিফের জন্য আমি কলকাতার বাইরেই গঙ্গার ধারে এই বাড়িটায় কাজ করছি। একটা অন্য রকম মেজাজ আসবে। তাই শেষটা একটু বদলেছি,” জানালেন সন্দীপ। সমাদ্দারের চাবিতে মেলোকর্ড এবং আরও নানা যন্ত্রের কথা আছে। সেই সব যন্ত্র জোগাড় হল কীভাবে? “মেলোকর্ড তো একটা কাল্পনিক যন্ত্র। তাই মেলোকর্ড, খামাঞ্চে আমাদের বানাতে হয়েছে,” বললেন তিনি, “আরও কিছু জিনিস আমরা বানিয়েছি। কাজেই ঘরটা খুব জমজমাট হয়েছে। এটা আমি দুটো ঘর করেছি।”

ছবির শুটিংও হয়েছে নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে। সমাদ্দারের চাবির শুটিংয়ের একটা বড় অংশ হয়েছে বোলপুরে। তা ছাড়া যাত্রাপাড়া, কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান, শরবতের দোকানে গিয়েও শুটিং করেছেন সন্দীপ রায়। তবে ফেলুর বাড়ির শুটিং হয়েছে স্টুডিয়োয়।

ফেলুদা হিসেবে সব্যসাচী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত পরিচালক। বললেন, “বেণু (সব্যসাচী) খুব ভাল করে জানে, আমি কী চাই না-চাই। ভীষণ ভাল লাগছে। আবার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে। সাহেবও খুব ভাল করছে। তোপসের তো ডায়লগ বেশি নেই। তবে সাহেব সাইলেন্ট রিঅ্যাকশন খুব ভাল দিচ্ছে।”

শুটিংয়ের ফাঁকে কথা হল সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে। ফেলুদার ৫০ বছর পূর্তিতে ফেলুদা হিসেবে তাঁর ফিরে আসাও এক বিশেষ ব্যাপার। সব্যসাচী বললেন, “ফেলুদা করতে সব সময়ই ভাল লাগে। ফেলুদা চরিত্রটাকে ভীষণ ভালবাসি। একটা সময় নিজের মনে হয়েছিল, ফেলুদা হিসেবে আমায় মানাচ্ছে না। তাই সরে দাঁড়াই। এর পর আবির ‘বাদশাহী আংটি’ করল। কিন্তু তারপর সমস্যা দাঁড়াল আবিরকে ব্যোমকেশটাও করতে হবে। তখন আমি অনির্বাণের কথা বলেছিলাম। কিন্তু আলটিমেটলি বাবুদা বললেন, ‘এটা ফেলুদার ৫০ বছর। এটা তুমি করো।’ তারপর আমি ফেলুদার চরিত্র করতে রাজি হলাম। এটা একমাত্র চরিত্র যেটা আমি নিজে চেয়ে নিয়েছি। তা ছাড়া আমি তো ফেলুদার প্রকাশনার চেয়ে দশ বছরের বড়। আর ফেলুর চেয়ে আমি সতেরো বছরের ছোট। কাজেই সেই লজিকে আবার করছি।”

ফেলুদা করার জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছেন সব্যসাচী। বললেন, “চুল কালো করেছি। ভুঁড়ি কমিয়েছি। আসল কথা হল অভিনয়। যদি বাবুদা এবং দর্শকদের পছন্দ অনুযায়ী অভিনয়টা করতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। সহ-অভিনেতারাও খুব সাপোর্ট করছেন। সবচেয়ে বড় কথা, পরিচালকের ভূমিকায় সন্দীপ রায়।”

এই ছবিতে অভিনয় করছেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, রাজেশ শর্মা, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, শুভ্রজিৎ দত্ত সহ আরও অনেকে। সন্দীপ রায় বললেন, “এখন পর্যন্ত যে সব ফেলুদার ছবি করেছি, তার থেকে অনেককে নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু এটা একটা ট্রিবিউট ফিল্ম তাই পুরনোদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।”

ছবির শেষে থাকবে এক বিশেষ চমক। পরিচালক নিজেই বললেন, “এই অকেশনটাকে আমরা সেলিব্রেট করতে চাইছি। ছবির শেষে পরিচয়লিপি যখন দেখানো হয়, তখন সবাই সাধারণত উঠে যান। এবার যাতে না ওঠেন তার একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুরনো ছবি, পাণ্ডুলিপি, সাক্ষাৎকার দিয়ে যদি কিছু করা যায়। যেমন দ্বিতীয় মুকুল শান্তনুকে যদি একটা ইন্টারভিউ করা যায়। সাত-আট মিনিটের একটা কোলাজ থাকবে। মানে জমিয়ে শেষ করতে চাইছি।”

শট প্রস্তুত। সুখওয়ানির ঘরে ঢুকবে ফেলুদা, তোপসে আর সুবীরবাবু। উঠে পড়লেন পরিচালক। ডিসেম্বরে ছবির রিলিজ। সামনে এখন অনেক কাজ।

ফোটো: সৌরদীপ রায়

গোলোকধাম রহস্যের শুটিংয়ে

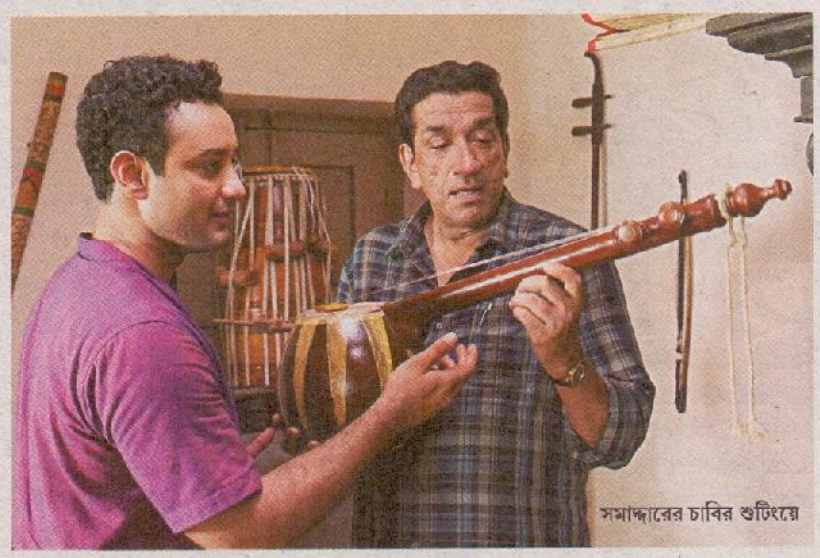

সমাদ্দারের চাবির শুটিংয়ে

আগুন ঝরানো আগ্নেয়গিরি

প্রকৃতির ধ্বংসলীলার এক প্রাচীন অস্ত্র হল আগ্নেয়গিরি। পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে আগ্নেয়গিরি ছিল, আজও আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই সে কখনও জেগে ওঠে কখনও ঘুমিয়ে পড়ে।

লিখেছেন জয়দীপ চক্রবর্তী

ছবিতে, টিভিতে বা সিনেমায় যে আগ্নেয়গিরিকে আমরা দেখি, আসলে সেটা কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর। পাহাড়ের মাথা ফুঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে গরম লাভা, ধোঁয়া, গ্যাস আর ছাই। ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। মনে করে দেখো, 'চাঁদের পাহাড়'-এ শঙ্কর আর আলভারেজ রাতের বেলায় কেমন আগ্নেয়গিরির ধ্বংসলীলার সামনে পড়েছিল। অগ্ন্যুৎপাতের তাণ্ডব থেকে বাঁচার তাগিদে জন্তু, জানোয়াররা কেমন ওদের তাঁবু অগ্রাহ্য করে প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছিল!

গল্পে অবশ্য শঙ্কর আর আলভারেজের কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, আগ্নেয়গিরির

জেগে ওঠার কারণে, বিভিন্ন সময়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। গরম লাভা, ধোঁয়া, গ্যাস আর ছাই তো আছেই। কোনওভাবে এসবের কোপ থেকে বাঁচলেও, এরপর মৃত্যু নামে আকাশ থেকে। আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গিরণের পর অনেক সময়ই যে অ্যাসিড বৃষ্টি শুরু হয়।

মানুষ বিজ্ঞানকে বন্ধু করে এখন অনেক কিছু জেনেছে, শিখেছে। আগ্নেয়গিরি সম্পর্কেও ধারণা তৈরি করেছে। তাই বশ করতে না পারলেও আগ্নেয়গিরির সঙ্গে সমঝোতা করে প্রাণহানি কমিয়ে ফেলেছে। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির থেকে বসবাস সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে অনেক দূরে। তাই পৃথিবীতে এখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটলেও, অসতর্কতা ছাড়া, তার জন্য প্রাণহানি আর হয় না।

আগ্নেয়গিরি আসলে কী

মাটির গভীরে থাকা গরম ম্যাগমা সবসময় ভূপৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কারণ, সেখানে অত্যন্ত উচ্চচাপে তরল অবস্থায় রয়েছে তারা। যখনই ভূপৃষ্ঠে কোনও ফাঁক পায়, তখন সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসে। তা কোনও পাহাড়ের চূড়া থেকে হতে পারে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে হতে পারে কিংবা বরফঢাকা মাটির বুকেও হতে পারে। উচ্চচাপে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক-অনেক উঁচুতে আর দূরে ছড়িয়ে পড়ে গরম ম্যাগমা, যাকে লাভা বলা হয়। ঠিক যেমন, দোলের দিন পিচকারিতে রং ভরে নিয়ে তারপর আস্তে-আস্তে পিচকারির হ্যান্ডেলে চাপ দিলে, অনেক দূর পর্যন্ত কারও গায়ে রং দেওয়া যায়। ম্যাগমা কী? কোথায় থাকে? ভূপৃষ্ঠের ফাটলই বা কী? সেসব জানতে হলে পৃথিবীর ভিতরটায় কী হচ্ছে, তা একটু জানতে হবে।

কেন এমন হয়?

যে পৃথিবীকে আমরা দেখছি সেটা পৃথিবীর উপরিভাগ। যেখানে সাগর আর মহাদেশ রয়েছে। ক্রমেই পৃথিবীর ভিতরে আমরা যদি ঢুকতে থাকি, তবে সেখানে আমরা নানা রকম জিনিস দেখতে পাব। যে কারণে উপরিভাগ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত পৃথিবীকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীর উপরিভাগ হল 'ক্রাস্ট' বা ভূত্বক যেখানে মানুষসহ জীবজগতের বাস। কোথাও মাটি, কোথাও পাথর, কোথাও বা শক্ত শিলা, ধাতুর আকরিক, কয়লা, এমনই সব জিনিস দিয়ে তৈরি এই ভূত্বক। যার আবার দুটো ভাগ আছে। একটি হল মহাসাগরীয় ভূত্বক আর-একটি হল মহাদেশীয় ভূত্বক। বোঝাই যাচ্ছে, স্থলভাগ আর জলভাগের জন্য দু'রকম ভূত্বক রয়েছে। মাটির নীচে পাঁচ থেকে ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর এই ভূত্বক। মহাদেশীয় ক্ষেত্রে এর গভীরতা বেশি। আবার সাগরের নীচে এর গভীরতা অনেকটাই কম। মোটামুটি শূন্য থেকে ৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা থাকে ভূত্বকের। যত মাটির নীচে যাওয়া যাবে তত তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। পরবর্তী ভাগ ম্যান্টেলের কাছাকাছি এই তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখো, পৃথিবীর অন্যতম গভীর খনি হল দক্ষিণ

আফ্রিকার টাউটুনা স্বর্ণখনি। মাটির নীচে প্রায় চার কিলোমিটার গভীর এটি। এখানে গরমকালে খনির শ্রমিকদের কাজ করার জন্য এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা রয়েছে।

ভূত্বকের পরের ভাগ হল ম্যান্টেল বা গুরুমণ্ডল। ভূত্বক শেষ হওয়ার পর থেকে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত ম্যান্টেল স্তর বিস্তৃত। এই ভাগে অক্সিজেন, লোহা, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ক্যালসিয়াম সহ বিভিন্ন পদার্থ গলে যাওয়া প্লাস্টিকের মতো অবস্থায় থাকে। যা কঠিন আর তরলের মাঝখানের এক অবস্থা। তাপমাত্রা ৫০০ থেকে ৪০০০ ডিগ্রি পর্যন্ত। তবে ম্যান্টেলের বিশেষত্ব হল, তাপমাত্রার পার্থক্য সহ আরও নানা

কারণে এই আপাত তরল স্তরটি খুব আস্তে-আস্তে ঘুরছে।
ম্যান্টেলের পরের ভাগ হল আউটার কোর যাকে বাংলায় উর্ধ্ব বা বহিঃ গুরুমণ্ডল বলা হয়। মাটির নীচে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত এই স্তর রয়েছে। এখানে লোহা, সালফার, অক্সিজেন সহ অন্যান্য

ভূত্বক ফেটে বেরিয়ে আসছে লাভা

পদার্থ সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর মোট ভরের প্রায় তিরিশ শতাংশ হল এই স্তর। এখানকার তাপমাত্রা চার থেকে ছয় হাজার ডিগ্রি। পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর ঘোরার কারণে এই তরলস্তরও তার সঙ্গে-সঙ্গে খুব আস্তে-আস্তে ঘুরছে। গতিবেগ মোটামুটি ২০ মিলিমিটার প্রতি বছর। তবে আউটার কোরের যত নীচে যাওয়া যাবে ততই সেখানকার গতিবেগ কমবে। শেষ স্তর হল ইনার কোর, অন্ত বা নিম্ন গুরুমণ্ডল। পাঁচ হাজার থেকে ছ'হাজার চারশো কিলোমিটার গভীরে পৃথিবীর কেন্দ্রকে ঘিরে রয়েছে এই স্তর। এই স্তরটি আসলে লোহা আর নিকেল দিয়ে তৈরি এক কঠিন ধাতুর বলয়। যেখানকার তাপমাত্রা ছ'হাজার ডিগ্রি।

ভূপৃষ্ঠের ফাটল

পৃথিবীর যে উপরিভাগ অর্থাৎ ভূত্বকে আমরা রয়েছি, তা কিন্তু একটাই নিরেট গোলাকার কোনও পদার্থ নয়। অনেক ছোট-বড় প্লেট রয়েছে সেখানে। ভূত্বক এবং ম্যান্টেলের কিছুটা অংশ নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ধরনের প্লেট। যেগুলোকে টেকটনিক প্লেট বলা হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর উপরিভাগ মূলত এমনই সাতটি বিশাল প্লেট নিয়ে গঠিত। এই মূল সাতটি প্লেটকেও আবার নানা ভাগে ভাগ করেছেন ভূবিজ্ঞানীরা। এই প্লেটগুলোর সীমানা কখনও একটা অন্য একটার নীচে, কখনও আবার অন্য কোনও প্লেটের উপরে রয়েছে। দুটো প্লেটের এই সংযোগস্থলগুলোতেই ফাটল থাকে। যে কারণে যেখানে-যেখানে টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে, পৃথিবীর উপরে সেই সব জায়গাতেই আগ্নেয়গিরি তৈরি হয়েছে।
এবার আসা যাক ম্যাগমার কথায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরের দ্বিতীয়ভাগ ম্যান্টেলের তাপমাত্রা এবং তারমধ্যে থাকা আধা-তরল পদার্থের গতির জন্য টেকটনিক প্লেটগুলো নড়াচড়া করছে। একটা প্লেট সারাক্ষণ চেষ্টা করছে তার পাশের প্লেটকে ঠেলতে। এই ঠেলাঠেলির ফলে কোনও প্লেট নড়ে গেলেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। যার ফলে প্লেটগুলোর সংযোগস্থলের ভাঙন আরও বড় হয়ে ওঠে। আর সেখান দিয়েই ম্যাগমা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, আগ্নেয়গিরি তৈরি করে। ভূত্বকের নীচের ভাগে ম্যান্টেলের অতি উচ্চ তাপমাত্রা পাথর গলিয়ে এই ম্যাগমার সৃষ্টি করে। যার মধ্যে গলে থাকা ধাতু, গ্যাস এমন অনেক কিছু থাকে যা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় বাইরে বেরিয়ে আসে, যাকে লাভা বলা হয়। ঠান্ডা হয়ে লাভা আবার শক্ত পাথরে পরিণত হয়।

আগ্নেয়গিরির ভাগ

জীবিত, সুপ্ত এবং লুপ্ত এই তিনটি ভাগে বিজ্ঞানীরা আগ্নেয়গিরিকে ভাগ করেছেন। যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি থেকে এখনও সময়ে-সময়ে লাভা উদ্‌গিরণ হচ্ছে, তাদের বলা হয় জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। আবার কিছু আগ্নেয়গিরি বহু বছর আগে লাভা বের করে দিয়ে এখন ঘুমিয়ে রয়েছে। যে-কোনও সময় তারা জেগে উঠতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, তাদের বলা হচ্ছে সুপ্ত বা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। অনেক আগ্নেয়গিরি রয়েছে যারা একসময় লাভার উদ্‌গিরণ ঘটিয়ে এখন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কখনও তাদের চূড়ামুখ থেকে লাভা বের হবে না। কারণ ম্যাগমা আর তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না। এই সব আগ্নেয়গিরিকে লুপ্ত ভাগে রাখা হয়েছে। তবে আগ্নেয়গিরি যেমন কয়েক বছর অন্তর জেগে ওঠে, তেমনই কয়েক লক্ষ বছর পরপর তারা হঠাৎ জেগে উঠতে

আগ্নেয়গিরি নারকোদাম

ব্যারান দ্বীপ আগ্নেয়গিরি

পারে। তাই জীবিত আর সুপ্ত এই দুই ভাগ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও বিতর্ক রয়েছে। ভারতের আন্দামান দ্বীপ থেকে ১১৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি নারকোদাম। তামিল ভাষায় যার মানে নরকের ফাঁদ। ২০০৫ সালেও এই আগ্নেয়গিরি থেকে সামান্য লাভা আর ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এই আগ্নেয়গিরির দক্ষিণ দিকে রয়েছে ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ব্যারন দ্বীপ। ২০১১ সালে এর মুখ থেকে লাভা, ধোঁয়া আর ছাই বের হয়। তার আগে ১৭৭ বছর ঘুমিয়ে থাকার পর ১৯৯১ সালে হঠাৎ একবার জেগে উঠেছিল ব্যারন দ্বীপ আগ্নেয়গিরি। আকৃতি আর লাভার বের করার ধরন দেখে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে আগ্নেয়গিরিকে। তা হল, স্টারটো বা সংযুক্ত, সিন্ডার কোন বা শঙ্কু আকৃতি এবং শিল্ড বা ঢাল আগ্নেয়গিরি। স্টারটো বা সংযুক্ত আগ্নেয়গিরির মাথা থেকে বিভিন্ন মুখ দিয়ে লাভা বের হয়। বিভিন্ন সময়ের লাভা স্তরে-স্তরে জমাট বেঁধে আগ্নেয়গিরিকে মাথা সরু এক পাহাড়ের আকার দেয়। মাউন্ট ভিসুভিয়াস হল এই ধরনের আগ্নেয়গিরি। সিন্ডার কোন বা শঙ্কু আকৃতির ক্ষেত্রে, লাভা সেই আগ্নেয়গিরির মাথায় একটা বিশাল বাটির মতো জায়গা থেকে গড়িয়ে পড়ে। তরল আকারে সেই লাভা আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে প্রতিবার একই জায়গা বেয়ে নেমে আসে। যেমন খোলা কলের নীচে বালতি উপচে জল পড়ে তেমন। এই ধরনের আগ্নেয়গিরির উচ্চতা কম হয়। আর শিল্ড বা ঢালের ক্ষেত্রে, আগ্নেয়গিরির, মুখ ছাড়াও তার গা বিভিন্ন জায়গায় ফেটে গিয়ে তরল লাভা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে। উপর থেকে আগ্নেয়গিরিকে তখন দেখলে মনে হবে, কোনও যোদ্ধার ঢাল যেন। এই ধরনের আগ্নেয়গিরির উচ্চতা কম হলেও এরা বিরাট এলাকা জুড়ে থাকে। হাওয়াই দ্বীপের মৌনা কেয়া হল এমন ধরনের আগ্নেয়গিরি।

এখনও জেগে রয়েছে যারা

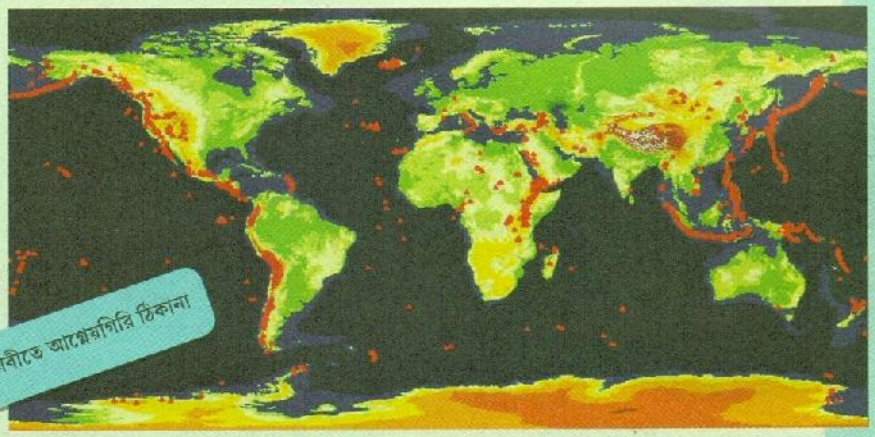

পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরি ঠিকানা

উপরের মানচিত্রে লাল দাগ দেওয়া জায়গাগুলো বলে দিচ্ছে আজকের পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির অবস্থান। এই সব জায়গাগুলো আবার বিভিন্ন টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থল। বরফের দেশ

ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট সিনাবুঙ্গ

আইসল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ় পর্বতমালা, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা সব জায়গাতেই ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়গিরি। কোথাও জীবিত, কোথাও সুপ্ত আবার কোথাও লুপ্ত। পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে লক্ষ-লক্ষ আগ্নেয়গিরি লাভা উদ্‌গিরণ করেছে। তাতে স্থলভাগ উঁচু হয়েছে, খনিজ সম্পদ বেড়েছে আবার মাটিও উর্বরও হয়েছে। গত দশ হাজার বছরের হিসেব ধরলে, হাজারদেড়েক জীবন্ত আগ্নেয়গিরির কথা বিজ্ঞানীরা এখনও জানতে পেরেছেন। তবে সমুদ্রের অতল গহ্বরে কোথায় কোন আগ্নেয়গিরি কী অবস্থায় রয়েছে, তাঁর খোঁজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

মাউন্ট সিনাবুঙ্গের ছাইয়ে ঢাকা বাড়িঘর

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি এবং ভয়ঙ্কর সব আগ্নেয়গিরি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে এক বিশেষ অঞ্চলে। আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে এশিয়ার পূর্ব প্রান্ত জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স হয়ে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ পর্যন্ত যা বিস্তৃত। ঘোড়ার খুরের মতো দেখতে এই অঞ্চলটিকে ভূবিজ্ঞানীরা 'রিং অফ ফায়ার' নাম দিয়েছেন। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ফুঁসে ওঠা, হঠাৎ-হঠাৎ ভূমিকম্প হওয়া এই সব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। সেখানকার এবং অন্য এলাকার কিছু জীবন্ত আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে এবার দু'-চার কথা জেনে নিই।

মাউন্ট সিনাবুঙ্গ (ইন্দোনেশিয়া)

ইন্দোনেশিয়া দেশটি 'রিং অফ ফায়ার' অঞ্চলে পড়ায় এই দেশে ১২৯টি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। দেশের উত্তর সুমাত্রা প্রদেশে রয়েছে মাউন্ট সিনাবুঙ্গ আগ্নেয়গিরি। প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঁচু এই আগ্নেয়গিরি ১৬০০ সালে একবার জেগে উঠেছিল। তারপর ১৯১২ সালে ধোঁয়া আর কিছু ছাই বেরিয়ে এসেছিল মাত্র। কিন্তু চারশো বছর পর, ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর নিয়ম করে এই আগ্নেয়গিরি থেকে আবার লাভা, ছাই, ধোঁয়া বের হয়ে আসছে। চার মুখের মাউন্ট সিনাবুঙ্গ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরের লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আগ্নেয়গিরির ছাই। এবছর মে মাসে শুরু হয়ে অগস্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার মাউন্ট সিনাবুঙ্গ থেকে লাভা, ধোঁয়া আর ছাই বেরিয়ে এসেছে। সেই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সাতজনের জীবনহানি ঘটে। ২০১৪ সালে আগ্নেয়গিরির আশপাশের চার কিলোমিটার জায়গা বিপজ্জনক বলে, সেখান থেকে স্থানীয় মানুষজনকে সরিয়ে দেয় ইন্দোনেশিয়ার সরকার। তবুও কিছু লোক সেখানে থেকে যান। সেবছরও আগ্নেয়গিরির গ্যাস আর ছাইয়ের মেঘে ঢাকা পড়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেন ১৬ জন।

ক্রাতাতাউ (ইন্দোনেশিয়া)

ইন্দোনেশিয়ার জাভা আর সুমাত্রা দ্বীপের মাঝে সমুদ্রের উপর ক্রাতাতাউ দ্বীপ এই আগ্নেয়গিরির ঠিকানা। স্টারটো বা সংযুক্ত ধরনের আগ্নেয়গিরি এটি। দু'শো

বছর ঘুমিয়ে থাকার পর ১৮৮৩ সালে জেগে ওঠে ক্রাতাতাউ। আর তাতে ধ্বংসের ইতিহাসে নিজেকে ভয়ঙ্কর হিসেবে তুলে ধরেছে এই আগ্নেয়গিরি। চার মাস ধরে হওয়া লাভা বিস্ফোরণে, ভূমিকম্পে আর তার ফলে তৈরি হওয়া সুনামিতে তখন দ্বীপের প্রায় ৩৬,০০০ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল ক্রাতাতাউ। গোটা দ্বীপটার দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল লাভার কারণে। বিজ্ঞানীরা বলছেন হিরোশিমা, নাগাসাকিতে যে অ্যাটম বোমা পড়েছিল তার ১৩০০ গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল ক্রাতাতাউ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। ১৯৯৯ এবং ২০০৯ সালে আবার দেখা যায় ক্রাতাতাউয়ের মুখ জ্বলছে। লাভা বেরিয়ে আসছে। এখন অবশ্য শান্ত রয়েছে সে। তবে যে-কোনও সময় আবার জেগে উঠতে পারে সে। ক্রাতাতাউ দ্বীপের পাশেই ১৯২৭ সালে একটি নতুন দ্বীপ ভেসে ওঠে। গত নব্বই বছরে তা হাজার ফুট উঁচু হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা নতুন এই দ্বীপকে 'আনা ক্রাতাতাউ' মানে ক্রাতাতাউয়ের সন্তান বলছেন। আর জানাচ্ছেন যে, নতুন দ্বীপ থেকেই আবার জেগে উঠতে পারে ক্রাতাতাউ।

মাউন্ট পেলে (মার্টিনিক)

ক্যারাবিয়ান সাগরের মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপ মার্টিনিক। মাত্র এক হাজার স্কোয়ার কিলোমিটারের কিছু বেশি জায়গা নিয়ে দ্বীপটি তৈরি হয়েছে। যা এখনও ফ্রান্সের অধীন। ছোট্ট এই দ্বীপেই রয়েছে মাউন্ট পেলে নামে স্টারটো বা সংযুক্ত ধরনের এক আগ্নেয়গিরি। উচ্চতায় ৪৫৮৩ ফুট। বর্তমানে এই আগ্নেয়গিরি জীবিত, লুপ্ত না ঘুমন্ত তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। কারণ এই আগ্নেয়গিরির পাদদেশে এখনও ভূমিকম্পজনিত কম্পন অনুভূত হচ্ছে। আবার অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, লাভা উদ্‌গিরণের মতো যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাগমা নেই মাউন্ট পেলের অন্দরে। শেষবার ১৯০২ সালে হঠাৎই ভয়াবহ বিস্ফোরণে জেগে উঠেছিল আগ্নেয়গিরিটি। তছনছ করে দেয় গোটা দ্বীপটাকে। প্রাণ যায় তিরিশ হাজারেরও বেশি মানুষের। দ্বীপের সবচেয়ে বড় আর সুসজ্জিত শহর ছিল সাঁ পিয়াহো। যাকে 'প্যারিস অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজ' বলা হত। সকাল আটটায় শুরু হয়ে তিন মিনিটের মধ্যে মাউন্ট পেলের লাভায় চাপা পড়ে যায় সাঁ পিয়াহো। কেবল তিনজন মানুষ নাকি প্রকৃতির এই তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সেসময়। অভিশপ্ত শহরের ধ্বংসের ইতিহাস, তাঁদের কাছ থেকেই পরে জানা যায়। ১৯২৯ সালে খুব অল্প হলেও গ্যাস আর ধোঁয়া বেরতে দেখা গিয়েছিল মাউন্ট পেলের শিখর থেকে। এখন এই দ্বীপ সমুদ্রসৈকত-বিলাসীদের কাছে এক অত্যন্ত জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পট। যদিও মাউন্ট পেলের খামখেয়ালিপনা নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তা কিন্তু রয়েই গিয়েছে।

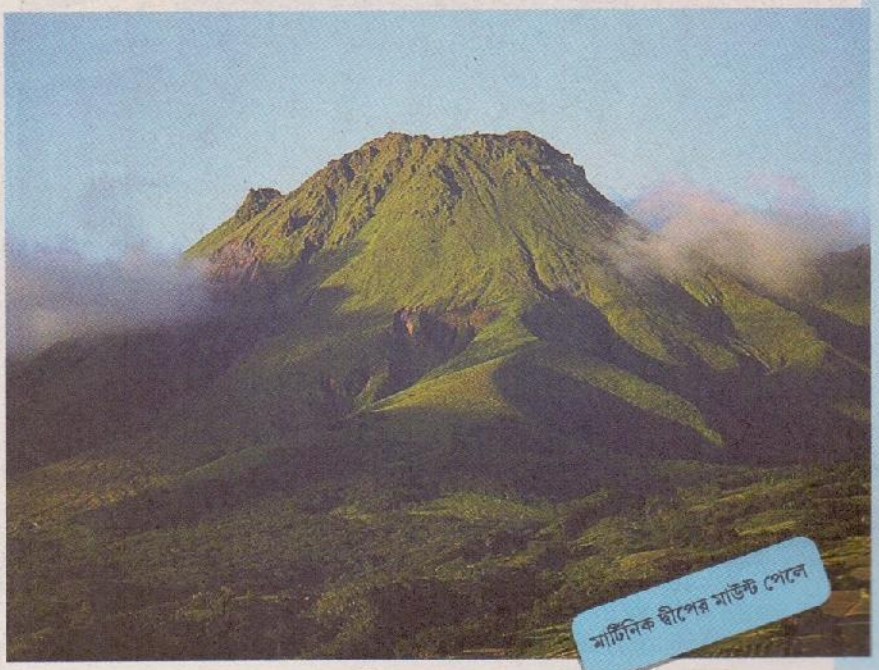

মার্টিনিক দ্বীপের মাউন্ট পেলে

আইসল্যান্ডের এ ইয়াফিয়াতলা ইয়োকুৎ আগ্নেয়গিরি

এ ইয়াফিয়াতলা ইয়োকুৎ (আইসল্যান্ড)

এবার বরফের মধ্যে থাকা এক আগ্নেয়গিরিকে আমরা দেখব। আইসল্যান্ড দেশটা অতলান্তিকের উপর ভেসে থাকা ছোট্ট একটা দেশ। গ্রেট ব্রিটেনেরও উত্তরে, গ্রিনল্যান্ডের

কাছাকাছি। বরফের রাজ্য হলেও এই দেশে ১৩০টিরও বেশি আগ্নেয়গিরি রয়েছে। যার মধ্যে ৩০টি এখনও জীবন্ত।

ইতালির মাউন্ট এৎনা আগ্নেয়গিরি

কারণ একই। দুই টেকটনিক প্লেট উত্তর আমেরিকান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংযোগস্থলের উপর দেশটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আইসল্যান্ডে রয়েছে ১৬৬৬ ফুট উঁচু আগ্নেয়গিরি এ ইয়াফিয়াতলা ইয়োকুৎ, যার উপরটা বরফে ঢাকা। মাথার ব্যাসার্ধ প্রায় তিন কিলোমিটার। আসলে অনেক সময় আগ্নেয়গিরির মাথা থেকে লাভা উদ্‌গিরণের পর সেখানটা বিরাট গর্তের আকার নেয়। গর্ত না বলে বরং জলশূন্য ফাঁকা হ্রদ বললে বোধ হয় ভাল হয়। এর মুখটাও তেমন। এ ইয়াফিয়াতলা ইয়োকুৎ আগ্নেয়গিরি গত হাজার বছরে মাত্র পাঁচ বার জেগে উঠেছিল। ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত শেষবার লাভা, ছাই আর ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করে ইউরোপ, আমেরিকায় প্লেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল এই আগ্নেয়গিরি। বরফের ভিতর থেকে লাভা বেরিয়ে আসার ফলে প্রচুর ছাই আর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। যা মাটির প্রায় ১১ কিলোমিটার উপরে ছড়িয়ে যায়। আর অতলান্তিকের হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছাই মেঘের মধ্যে দিয়ে প্লেন চালালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখে বিভিন্ন সংস্থা। এই আগ্নেয়গিরির ২৫ কিলোমিটার পাশেই রয়েছে কাটলা নামে আর-একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।

মাউন্ট এৎনা (ইতালি)

ইতালির আগ্নেয়গিরি বললেই সবার আগে মনে আসে মাউন্ট ভিসুভিয়াসের কথা। যার লাভা বিস্ফোরণে এক সময় পম্পেই শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শেষ বার ১৯৪৪ সালে এই আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে। বর্তমানে ইতালির সবচেয়ে বড় জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হল মাউন্ট এৎনা। ইতালির দক্ষিণ প্রান্তে সিসিলি দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে এই আগ্নেয়গিরিটির উচ্চতা প্রায় ১১ হাজার ফুট। ভিসুভিয়াসের সেখানে চার হাজার ফুটের কিছু বেশি। আফ্রিকান প্লেট আর ইউরেশিয়ান প্লেটের সংযোগস্থলের উপর রয়েছে মাউন্ট এৎনা। যা স্টারটো বা সংযুক্ত ধরনের এক আগ্নেয়গিরি। মুখ রয়েছে চারটি। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই আগ্নেয়গিরির বয়স প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে জেগে উঠে লাভা ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের মধ্যে ১৬৬৯ সালের পর ১৯২৮ সালে বেশ বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাউন্ট এৎনা জেগে ওঠে। তারপর ১৯৪৯ সাল থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে লাভা, ছাই, ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছে প্রচুর পরিমাণে। এখন মাউন্ট এৎনা ইতালির এক নামকরা টুরিস্ট স্পট। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির পায়ের কাছেই রয়েছে ক্যাটানিয়া শহর। কেবল কারে করে সেখান থেকে টুরিস্টদের পাহাড়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আগ্নেয়গিরিকে ঘিরে রেলপথও তৈরি হয়েছে একশো বছর আগে। ২০১৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ মাউন্ট এৎনা আগ্নেয়গিরিকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' বলে ঘোষণা করেছে। 'ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলক্যানোলজি অ্যান্ড কেমিস্ট্রি অফ দ্য আর্থস ইন্টিরিয়র' সংস্থা, যারা পৃথিবীর

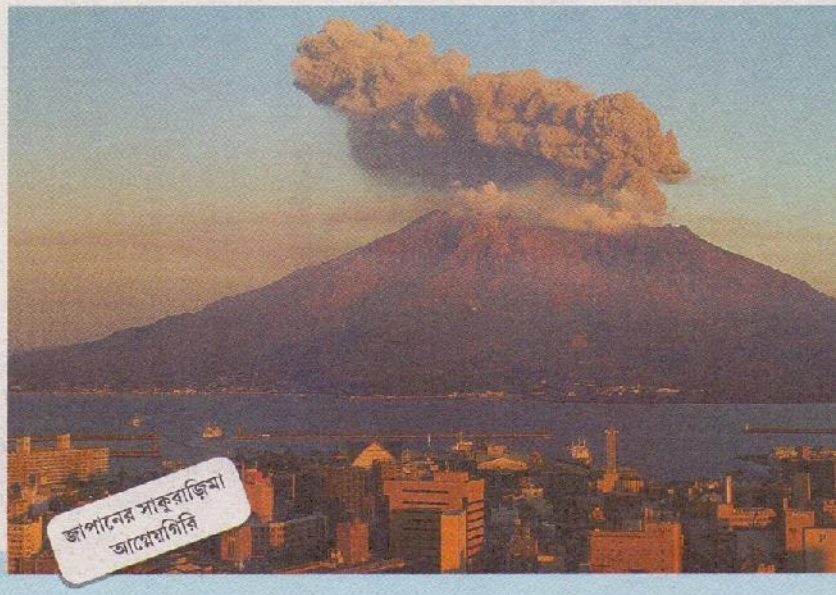

জাপানের সাকুরাজিমা আগ্নেয়গিরি

কলম্বিয়ার নেভাদো দেল রুইজ (কলম্বিয়া)

বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ নিয়ে গবেষণা করছে, তারা বিশ্বের ১৬টি আগ্নেয়গিরিকে 'ডিকেড ভলক্যানো' তকমা দিয়েছে। আগ্নেয়গিরির ধ্বংসলীলা, জনবসতির কত কাছে তারা রয়েছে এমন সব বিষয় বিবেচনা করে মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই এমন উদ্যোগ। মাউন্ট এৎনা এই তকমা পাওয়া ১৬টি আগ্নেয়গিরির মধ্যে একটি।

সাকুরাজিমা (জাপান)

'রিং অফ ফায়ার'-এর মধ্যে রয়েছে জাপান। সেখানে ১০০টিরও বেশি আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব রয়েছে। মাঝে মধ্যেই সেগুলো জেগে ওঠে। সম্প্রতি তেমনই জেগে উঠেছিল সাকুরাজিমা আগ্নেয়গিরি। জাপানের দক্ষিণে চিসু প্রদেশে সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু এই আগ্নেয়গিরির তিনটি মুখ রয়েছে। আগ্নেয়গিরির আট কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে কাগোশিমা শহর যেখানে পাঁচ লক্ষ লোকের বাস। আর ৫০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সেনডাই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট। যেখানে নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, অষ্টম শতাব্দী থেকে সাকুরাজিমা আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে লাভা, ছাই বেরোচ্ছে। যদিও পাঁচ হাজার বছর আগেও যে এই আগ্নেয়গিরি সক্রিয় ছিল এমন প্রমাণও তাঁরা পেয়েছেন। ১৯১৪ সালে প্রচুর পরিমাণে লাভা বেরিয়ে আসে এই আগ্নেয়গিরি থেকে। তারপর তা জমে গিয়ে নতুন দ্বীপ তৈরি করে। ১৯৫৫ সাল থেকে নিয়মিতভাবে আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে লাভা, ছাই আর ধোঁয়া বেরতে দেখা যাচ্ছে। যে কারণে ১৯৬০ সালে জাপান সরকার সাকুরাজিমার নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য গবেষণাগার তৈরি করে। এই শতাব্দীতে ২০০৯ থেকে কয়েক বছর অন্তর জেগে উঠছে সাকুরাজিমা। গত বছরের অগস্ট মাস থেকে এবছর জুলাই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময় এর মুখ থেকে লাভা, ধোঁয়া আর ছাই বেরিয়ে এসেছে। যা ছড়িয়ে পড়ে দুই কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। তখন এর আগে-পরে আগ্নেয়গিরির আশপাশের জায়গায় ছোট-বড় ভূমিকম্পও হয়। তাই এই আগ্নেয়গিরি আর তার চারপাশ হল এখন জাপানের সবচেয়ে বেশি 'অ্যালার্ট জোন'। সাকুরাজিমা আগ্নেয়গিরিকেও ডিকেড ভলক্যানোর তালিকায় রাখা হয়েছে।

নেভাদো দেল রুইজ (কলম্বিয়া)

সাম্প্রতিককালে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কলম্বিয়ার এই আগ্নেয়গিরিটি। সাড়ে সতেরো হাজার ফুট উঁচু নেভাদো দেল রুইজের চূড়া বরফে ঢাকা। ১৯৮৫ সালের নভেম্বরে যখন এই আগ্নেয়গিরি আবার জেগে উঠল, তখন সেই বরফ গলা জল আর আগ্নেয়গিরির ছাই মিশে দিয়ে কাদার স্রোত তৈরি করে, যা প্রবল বেগে নেমে আসে আরমেরো শহরের বুকে। হঠাৎ করে এই বিপদের মুখে পড়ে হকচকিয়ে যায় মানুষজন। অন্য জায়গার সরে যাওয়ার সময়টুকুও পাননি অনেকে। কাদার স্রোতে ডুবে গিয়ে শহরের প্রায় ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় সেসময়। স্থানীয় মানুষ কুমন্ডাই নামে ডাকে এই আগ্নেয়গিরিকে। এটিও স্টারটো বা সংযুক্ত ধরনের এক আগ্নেয়গিরি। সেজন্য লাভার স্তর জমতে-জমতে বিশাল উঁচু এক পর্বতের চেহারা নিয়েছে কুমন্ডাই। আগ্নেয়গিরিটির বয়স নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

চিলির ভিয়ারিকা আগ্নেয়গিরি

তবে প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে যে এই আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব ছিল তা জানতে পেরেছেন তারা। গত পাঁচশো বছরে মাত্র তিনবার লাভা উদ্‌গিরণ করেছে নেভাদো দেল রুইজ়। তবে এখনও সে জীবন্ত রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই আগ্নেয়গিরির মধ্যে আবার জেগে ওঠার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত গ্যাস আর ধোঁয়া বেরতে দেখা গিয়েছে এর মাথা থেকে। আর তাই নিয়ে চিন্তায় রয়েছে কলম্বিয়ার প্রশাসন। কারণ ১৯৮৫ সালে মতো ভয়াবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে।

ভিয়ারিকা (চিলি)

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তের দেশ চিলি। এই দেশটিও দাঁড়িয়ে রয়েছে 'রিং অফ ফায়ার'-এর উপর। যে কারণে পাঁচশোর বেশি আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া যায় এই দেশে। যেগুলোর অধিংকাশই আজ লুপ্ত এবং সুপ্ত। তবে ৯০টিরও বেশি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে এই দেশে। মাঝে-মাঝেই যাদের জ্বালামুখ থেকে লাভা বেরিয়ে আসে। চিলির দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে এমনই এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ভিয়ারিকা। চিলির রাজধানী শহর সানতিয়াগোর ৭৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছে ভিয়ারিকা। স্থানীয় মানুষ মাপুচে ভাষায় যাকে 'রুকাপিয়ান' মানে 'অশরীরীর আড্ডাখানা' বলে ডাকেন। আগ্নেয়গিরির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভিয়ারিকা লেক। একই নামে ছোট্ট একটা শহরও রয়েছে সেখানে। ভিয়ারিকা হল স্টারটো বা সংযুক্ত ধরনের আগ্নেয়গিরি। নয় হাজার ফুটের বেশি উচ্চতার এই আগ্নেয়গিরির চূড়া বরফে ঢাকা। ১৫৫২ সাল থেকে ভিয়ারিকায় যে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে তার প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এর পর নিয়মিত ২০-২২ বছরের ব্যবধানে জেগে উঠেছে ভিয়ারিকা। শেষবার মার্চ, ২০১৫ সালে লাভা উদ্‌গিরণ করেছে এই আগ্নেয়গিরি। সেসময় টানা চার মাস ধরে বিক্ষিপ্তভাবে লাভা বের হয় ভিয়ারিকা থেকে। প্রচুর মানুষকে শহর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে নয়। লাভা প্রায় এক হাজার ফুট উঁচুতে উঠে যায়। তবে অন্যদের তুলনায় এই আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মাত্রা অনেকটাই কম হয়।

মাউন্ট কিলোওয়া (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ)

পৃথিবীর মানচিত্রে জাপান আর আমেরিকার মাঝখানে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে ছোট-ছোট বিন্দুর মতো যে দ্বীপগুলো দেখা যায়, তা হল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণভাগে রয়েছে মাউন্ট কিলোওয়া আগ্নেয়গিরি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর জন্ম তিন লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ বছর আগে কোনও একটা সময়ে। তখন এটি মহাসাগরের নীচে ছিল। সাগরের উপর উঠে এসেছে এক লক্ষ বছর আগে। এখন উচ্চতা চার হাজার ফুটেরও বেশি। তবে বেশি উচ্চতা হলেও এটি শিল্ড বা ঢাল ধরনের আগ্নেয়গিরি। গবেষণায় দেখা

গিয়েছে, আগ্নেয়গিরির গায়ের উপরের ভাগে লাভা জমে গিয়ে যে শিলার আকার পেয়েছে তাদের বয়স এক থেকে তিন হাজার বছরের বেশি নয়। ১৮৮৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মাউন্ট কালোওয়া মাঝে-মধ্যেই জেগে উঠছে। ১৯৮৩ সালে প্রায় সাড়ে তিন ঘন কিলোমিটার লাভা বের হয়ে আসে এই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে এই রেকর্ড ভেঙে একবারে চার ঘন কিলোমিটার লাভা বের করে মাউন্ট কিলোওয়া। এক-একবারে আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে এতটা পরিমাণে লাভা বেরিয়ে আসার নজির বড় একটা দেখা যায় না। সেই কারণে একে হাওয়াই দ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী জীবন্ত আগ্নেয়গিরি বলা হচ্ছে। শেষবার ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জেগে উঠেছিল মাউন্ট কিলোওয়া। আপাতত ঘুমিয়ে রয়েছে। আগ্নেয়গিরিটির মাথার উপর যে খোলা মুখ রয়েছে, স্থানীয় ভাষায় সেই জায়গাকে 'হেলেমা উমায়ু' নামে ডাকা হয়। যার অর্থ, সেই জায়গাটি হল হাওয়াই দ্বীপের আগ্নেয়গিরির দেবী 'পেলে'র বাসস্থান। তবে মাউন্ট কালোওয়া যত ভয়ানকই হোক, এখন প্রতি বছর আড়াই লক্ষ পর্যটক আসেন একে দেখতে। অবশ্যই দূর থেকে।

নিয়ামুহাঙ্গিহা (গণপ্রজাতান্ত্রিক কঙ্গো)

আফ্রিকা মহাদেশে বর্তমানে দেড়শোরও বেশি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। যাদের একটা বড় অংশ রয়েছে মহাদেশের পূর্বভাগে। পৃথিবীর মানচিত্রে এই জায়গাতেই রয়েছে আফ্রিকা, আরব এবং ভারতীয় এই তিন টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থল। যার ফলে এখানে এমন অনেক কিছু ঘটে চলেছে যা আফ্রিকার মানচিত্র ভবিষ্যতে বদলে দিতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। আফ্রিকার আগ্নেয়গিরির মধ্যে এখন সবচেয়ে সক্রিয় হল কঙ্গো দেশের নিয়ামুহাঙ্গিহা আগ্নেয়গিরি। তবে তানজানিয়ার অলদিওইয়ো লেঙ্গাই আর ক্যামেরুনের মাউন্ট ক্যামেরুন এই দুই আগ্নেয়গিরিও সেই তালিকায় থাকবে। শিল্ড বা ঢাল ধরনের আগ্নেয়গিরি নিয়ামুহাঙ্গিহা। গত একশো বছরে ৪০ বার সক্রিয় হয়ে উঠে লাভা ছড়িয়ে দিয়েছে সে। দশ হাজার ফুট উচ্চতার এই আগ্নেয়গিরি থেকে শেষবার লাভা বের হয়েছিল ২০১১ সালে। তারপর ২০১৩ ও ২০১৪ সালে লাভা না বের হলেও ধোঁয়া আর ছাই এর জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সতর্ক রয়েছেন বিজ্ঞানীরা, সতর্ক স্থানীয় প্রশাসনও। কারণ আশপাশে মানুষের বাস না হলেও, জঙ্গলে প্রচুর শিম্পাঞ্জি রয়েছে। লাভার আক্রমণে তাদের জীবনহানি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। আগের হিসেব বলছে জ্বালামুখ থেকে ২৫ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায় এই আগ্নেয়গিরির লাভা। তাই চিন্তা স্বাভাবিক। আগ্নেয়গিরিটির কিছু দূরেই রয়েছে নিহিয়াগুঙ্গু নামে আর-একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।

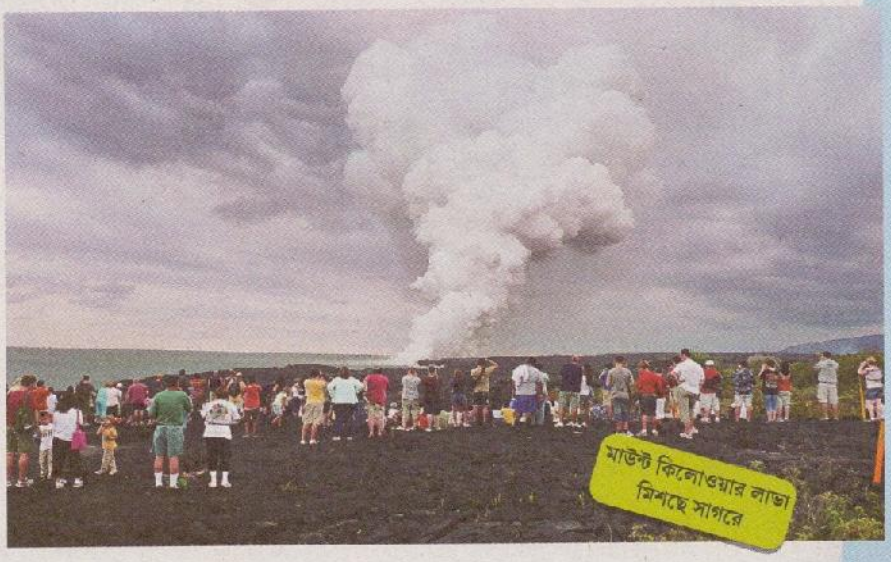

মাউন্ট কিলোওয়ার লাভা মিশছে সাগরে

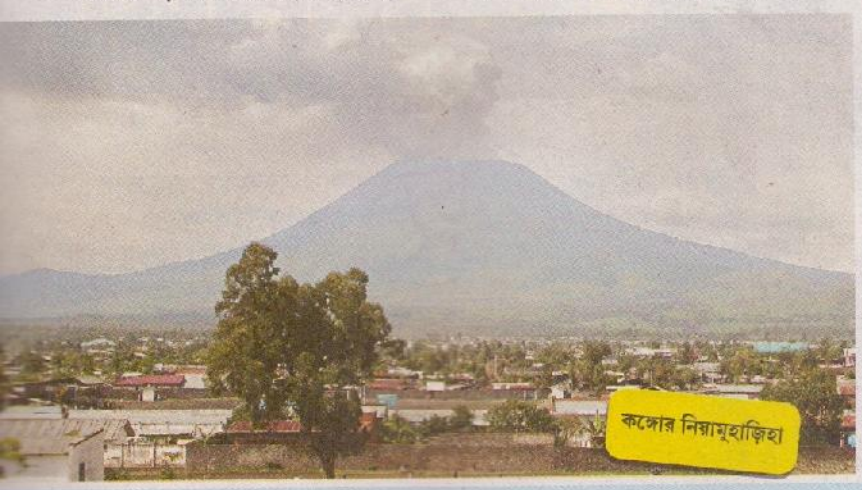

কঙ্গোর নিয়ামুহাঙ্গিহা

এগুলো ছাড়াও বুকের মধ্যে আগুন নিয়ে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আজও পৃথিবীর বুকে জেগে রয়েছে। কবে, কখন তাদের জ্বালামুখ থেকে সেই আগুন বেরিয়ে আসবে, কেউ বলতে পারে না। বিজ্ঞানীরাও না। তাঁরা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আগাম আভাস পেতে। আগ্নেয়গিরির কাছে ভূপৃষ্ঠের কম্পন, ম্যাগমার চলার সঙ্গে পালটে যাওয়া পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র, এসব দেখে-শুনে তাঁরা আগ্নেয়গিরির চরিত্র বোঝার চেষ্টা করছেন। লাভাবর্ষণের আগাম আভাস পাওয়ার এখনও অনেক দেরি রয়েছে।

মিতিলের স্বপ্ন দেখা

রম্যাণী গোস্বামী

ছবি আঁকতে একদমই ভালবাসে না মিতিল। স্কুলের বাকি বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই কী চমৎকার ছবি আঁকে! প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার দিন তেতো মুখে রাতুলদার ওখানে আঁকা শিখতে যায় ও। ভাল লাগে না। তবুও যেতে হয়। রাতুলদা ওর আঁকার খাতার সাদা পাতার উপরে রংবেরঙের কাগের ঠ্যাং-বগের ঠ্যাংগুলো

লক্ষ করে বলা।

"উফ, না কাকিমণি। দুধ-কর্নফ্লেক্স না, অ্যাহ! আমায় একটু নুডল্‌স বানিয়ে দাও না, প্লিজ," বলবে না ভেবেও বিকৃত মুখে বলেই ফেলল মিতিল।

"আজ আর এসব আবদার করিস নারে লক্ষ্মীটি। দেখছিস না তোর মায়ের অবস্থা? এখনই খবরের কাগজের লোকেরাও এসে পড়বে। যদিও তোকে বলা বারণ, তবুও বলছি। দু'দিন হয়ে গেল দাদাদের জাহাজটার কোনও ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও রকম ট্রান্সমিশন সিস্টেমে নাকি ধরা যাচ্ছে না ওটার গতিপথ। তোর বড়জেঠু ফোন করেছিলেন তাইওয়ান পোর্টে, তারাই বলেছে।"

"মানে? কোথায় হারিয়ে গেল অত বড় জিনিসটা?" মিতিল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কাকিমণির দিকে। পরমুহূর্তে বুকটা ছমছম করে উঠল ওর। গল্পের বইয়ে এমন অনেক কিছু পড়েছে ও। পড়েছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কথাও। বাপিদের কি কোনও বিপদ হয়েছে তবে?

কাকিমণিকে কেউ ডাকল নাম ধরে। বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। কুর্তিটায় আর-একবার টান পড়তেই ঘোর ভাঙল মিতিলের। কিশুর কথাটা তো ভুলেই গিয়েছিল ও। আনমনে কম্পিউটার অন করে হাতের কাছে হাবিজাবি যা পেল তাই চালিয়ে দিল ও।

"উফ, দিদিভাই এসব না," কিশু প্রবল বিরক্তিতে ঘাড় নাড়িয়েছে, "জেজের সেই ভিডিয়োটা দেখব। চালিয়ে দে।"

জেজে মানে বাপি। বাপির ভিডিয়ো প্রথমে কেমন যেন খই পেল না মিতিল। তারপরই মনে পড়ল। ওহ, হ্যাঁ, সেই গত বছর বড়দিনের ছুটিতে যখন বাপি বাড়ি এসেছিলেন তখন বাপির হ্যান্ডিক্যামে তোলা কয়েকটা ভিডিয়ো লোড করে দিয়েছিলেন এই মেশিনটায়। তার মধ্যে একটা কিশুর খুব প্রিয়। কিশু খাওয়া নিয়ে বড্ড ঝামেলা করলে কাকিমণি এঘরে এসে সেটা চালিয়ে দেন আর সঙ্গে-সঙ্গে দুষ্টুটা কেমন শান্ত হয়ে খেয়েও নেয় চটপট!

একটু খুঁজতেই পেয়েও গেল। পনেরো ইঞ্চির স্ক্রিনে ভেসে উঠল কূলহীন প্রশান্ত মহাসাগর। চারদিকে শুধু জল আর জল। রয়েছে জাহাজের ডেকের কিছু খণ্ড দৃশ্যও। পরপর সাজানো রংচঙে লম্বা চেয়ার। তাতে বসে রয়েছে কত রকম মানুষ! তাদের কত রকম পোশাক। কেবল বাপিই নেই কোথাও! থাকবেন কী করে? বাপির হাতেই তো ক্যামেরাটা। একটু পরেই দৃশ্য বদল ঘটল। জাহাজের ডেকের কিনারা থেকে নীচের দিকে ফোকাস করা হয়েছে। অনেক নীচে মসৃণ জলতল কেটে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। আর সে কী ফেনা! উচ্ছ্বসিত সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে নীল কাচের বুকে। এর পর বাপি ক্যামেরাটা একটু সোজা করে

জাহাজের পাশে-পাশে জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলছে তিনটি শুশুক। তাদের চকচকে গা থেকে জল ঝরে পড়ছে। ক্যামেরা জুম করা হল আরও। তিনটির মধ্যে একটি এবার লাফিয়ে উঠল সাঁ করে। আবার গোঁত্তা খেয়ে ঢুকে পড়েছে জলের গভীরে। তার আগে একবার তাকিয়েছে মিতিলের দিকে। ওর চোখের মণিদুটো কী স্বচ্ছ।

ধরলেন সম্ভবত। অমনি চেঁচিয়ে উঠল কিশু, "ওই যে দিদিভাই! ডলফিন! সেই তিনটে ডলফিন!"

জাহাজের পাশে-পাশে জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলছে তিনটি শুশুক। তাদের চকচকে গা থেকে জল ঝরে পড়ছে। ক্যামেরা জুম করা হল আরও। তিনটির মধ্যে একটি এবার লাফিয়ে উঠল সাঁ করে। আবার গোঁত্তা খেয়ে ঢুকে পড়েছে জলের গভীরে। তার আগে একবার তাকিয়েছে মিতিলের দিকে। ওর চোখের মণিদুটো কী স্বচ্ছ।

আজ মিতিলেরও হয়তো কিশুর দশা হয়েছে। গপগপ করে দিব্যি খেয়ে নিয়েছে কাকিমণির এনে দেওয়া বাটিভর্তি দুধ-কর্নফ্লেক্স। ওর স্থির দৃষ্টি আটকে রয়েছে এখন কম্পিউটার পরদায়।

সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল মিতিল। দেখল যে একটা বিশাল সমুদ্রের মাঝে ও একা ভেসে যাচ্ছে ছোট্ট একখানা বোটে। আকাশে এত বড় চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে জল। হঠাৎ সামনে স্পষ্ট দেখা গেল একটা বিরাট জাহাজ। জাহাজের সামনেই সাদা অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'ক্যুয়াক্যুয়া'! তা হলে তো বাপিও আছে ওই জাহাজে। গলা ফাটিয়ে এক হাত তুলে সে ডেকে উঠল, "বা-পি-ই-ই!"

এমন সময় কোথা থেকে একগুচ্ছ মেঘ এসে ঢেকে দিল সব। মুছে গেল চাঁদের আলো। বিকট কড়কড় শব্দে পড়তে লাগল বাজ। প্রবল ঝড় আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি। ইয়া বড় ঢেউ উঠল সমুদ্রের বুকে। ব্যস, উধাও হয়ে গেল জাহাজটা।

মিতিলের চোখ ফেটে জল এল। ইস, এত কাছে এসেও বাপিকে খুঁজে পেল না ও? এমন সময় ওর বোটের ঠিক পাশে জল ঠেলে এগিয়ে এল একটা মাথা। আরে, বিকেলে ভিডিয়োয় দেখা সেই শুশুকটা না? বোটের আগে-আগে সে চলতে লাগল মিতিলকে পথ দেখিয়ে। বহুক্ষণ চলার পরে ওরা যেখানে পৌঁছল, সেখানে সমুদ্র অনেক শান্ত। বৃষ্টির দাপটও কমেছে। ডলফিনটা তবুও থামছে না। কোথায় যেন নিয়ে যেতে চাইছে ও মিতিলকে। এবারে দূরে দেখা গেল যে আরও একটা অপেক্ষাকৃত বড় বোটকে। সোজা এগিয়ে আসছে এদিকে। কাছাকাছি আসতেই খুব জোরে ধকধক করে উঠল মিতিলের বুক। বোটের রেলিংয়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাপি। হাসছেন ওর দিকে তাকিয়ে, "তোমার মাকে বোলো যে কোনও চিন্তা না করতে। আমি একদম ঠিক আছি।"

তড়াক করে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল মিতিল। এখনও বাপির গলাটা কানে ভাসছে। এত জীবন্ত! যেন স্বপ্ন নয়, সত্যি-সত্যি এইমাত্র বাপি কথা বললেন ওর সঙ্গে। ছটফটিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাকে খুঁজল মিতিল। বিছানায় মা নেই। ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেল পুব দিকের জানলার শিক ধরে মা ঠায়

almagazine.in

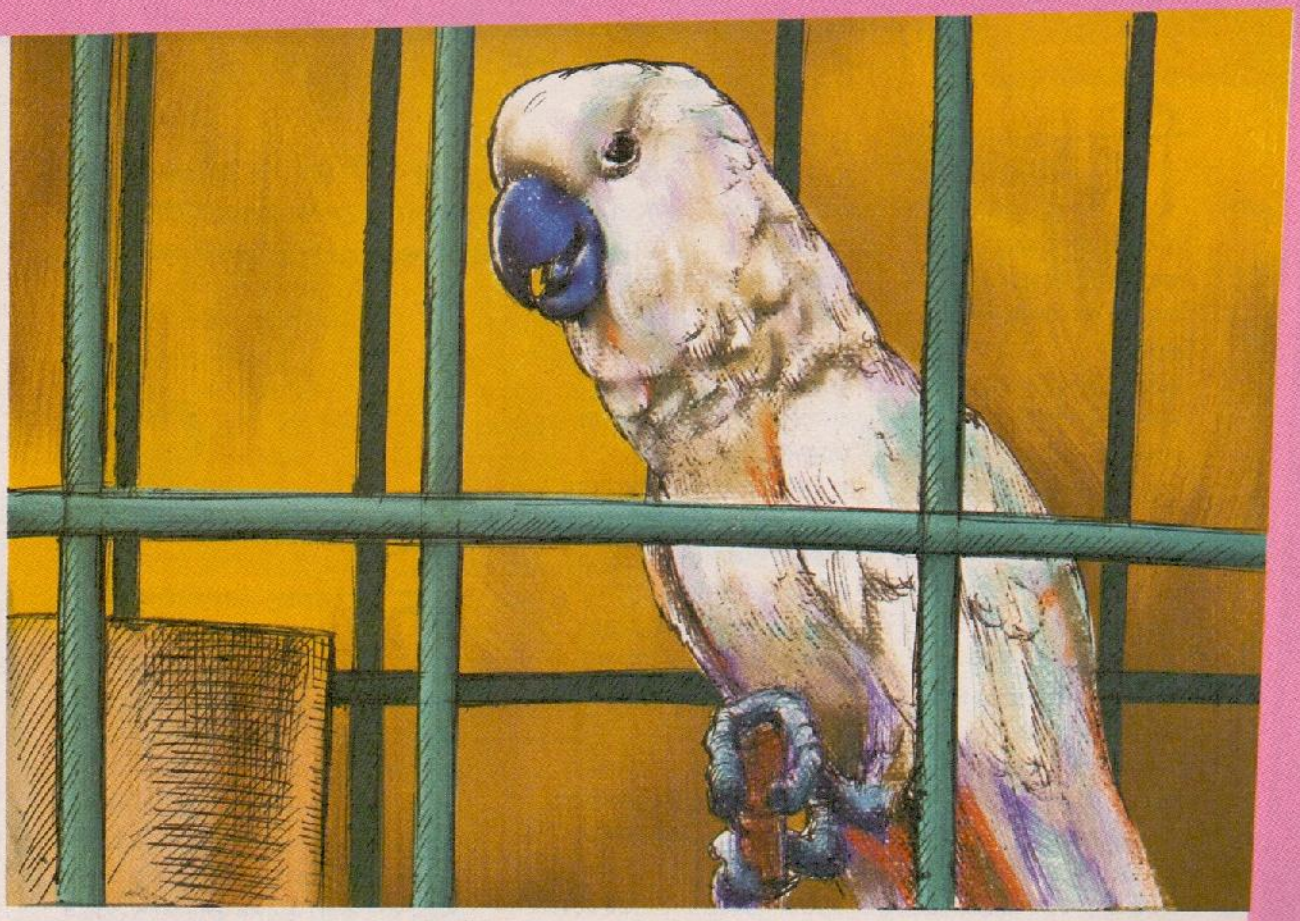

দাঁড়িয়ে। ও সোজা এগিয়ে গেল মায়ের দিকে।

মা ওর কথাগুলো শুনে খুব অবাক হয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হেসে উড়িয়ে না দিয়ে বরং খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মিতিলের মুখের দিকে। আকাশে অল্প-অল্প ভোরের আলো ফুটেছে। কাক ডাকছে একটি-দু'টি। নরম আলোয় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খুব চেনা, খুব প্রিয় একমাত্র সন্তানের সারল্যমাখা মুখের দিকে চেয়ে মায়ের বুকে যেন জন্ম নিল একটুখানি ভরসা। মিতিলকে জাপটে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা, "তাই যেন হয় মিতু, তাই যেন হয়।"

আজ শনিবার। সকাল থেকে রায় বাড়িতে প্রায় উৎসবের আবহ। গত চারদিন ধরে এবাড়ির জাহাজে কর্মরত যে মেজছেলের খবর পাওয়া যাচ্ছিল না, তাঁর খোঁজ মিলেছে। অকস্মাৎ এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের খপ্পরে পড়েছিল তাঁদের জাহাজ। সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বেভুলের মতো শুধু ঘুরেছিল পথ হারিয়ে। অবশেষে অনেক চেষ্টায় তাঁদের উদ্ধার করে আনা হয়েছে তীরে। বাড়িতে ফোন করে নাকি পরিবারের লোকদের সঙ্গে কথাও হয়েছে তাঁর। এলাকার স্থানীয় খবরের কাগজের সবগুলোয় বেরিয়েছে এই চমকপ্রদ খবর।

বিকেলে ফের কাঁধে ঝোলাব্যাগ ভরে আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে মিতিল হাজির হল রাতুলদার ক্লাসে। গোদের উপর বিষফোঁড়া। আজ আবার সেই বীভৎস আঁকার পরীক্ষা। অটো পেতে দেরি হয়েছে একটু। বাড়ি থেকে বেরতেই দেরি হয়ে গিয়েছে আসলে। সকাল থেকেই কত লোকজন। এসেই চলেছে, এসেই চলেছে। মায়ের আর কাকিমণির চা করতে-করতে আর ছোটকার পাড়ার মিষ্টির দোকানে দৌড়তে-দৌড়তে দম বেরিয়ে গিয়েছে একেবারে।

যা ভেবেছিল তাই। বন্ধুরা আঁকতে শুরু করে দিয়েছে। সকলের পিছনে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল মিতিল। একটুও তাড়াহুড়ো করল না অন্যান্যবারের মতো। বরং চুপচাপ বসে মিনিটখানেক ধ্যানস্থ হয়ে রইল সাদা আর্ট পেপারের দিকে তাকিয়ে। ধীরে-ধীরে ওর মুখে ফুটে উঠল একটা মৃদু হাসি। তারপর ঝুঁকে পড়ল মিতিল কাগজের উপর।

এবারে মিতিলদের স্কুলে কী হয়েছে জান? সব বন্ধুরা ওর আঁকার পরীক্ষার রেজাল্ট শুনে একেবারে চমকে গিয়েছে। জনে-জনে এসে মিতিলকে অভিনন্দন জানানোর একেবারে ধুম পড়ে গিয়েছে। রহস্যটা কেউ যদিও বুঝতে পারছে না। মিতিলও কাউকে কিচ্ছুটি না বলে মিটিমিটি হাসছে শুধু। তোমরা যদি বুঝতে চাও তবে সোজা চলে যাও রাতুলদার ক্লাসে। ওখানে ফার্স্ট হওয়া ছবিটি সযত্নে দেওয়ালে আটকানো আছে কিনা!

গেলেই দেখতে পাবে সেই ছবিটি। পাতা জুড়ে ঘন নীল সমুদ্র। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বিশাল সমুদ্রে একটি ছোট বোট ভাসছে। তাতে বসে রয়েছে একটি মেয়ে। আর বোটের সামনেই জলের বুকে ফেনা তুলে লাফিয়ে চলেছে একটি শুশুক।

দেখেই সোজা চুপটি করে চলে আসবে। মিতিলের স্বপ্নটা আবার ওর বন্ধুদের কাছে ফাঁস করে দিয়ো না কিন্তু প্লিজ!

ছবি: দীপঙ্কর ভৌমিক

ধরো একটা মাছ যদি অন্য মাছের সঙ্গে কথা বলে। সে কী বলবে? এই কাল্পনিক কথোপকথন লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

বিদ্যালয়সংলগ্ন মাঠের পার্শ্ববর্তী পুকুরের ছোট দুটো মাছ কী যেন বলাবলি করছিল। তাদের আলোচনায় বুঝলাম একজনের নাম কার্তিক, অন্যজনের নাম হল গণেশ।

কার্তিক: দেখেছিস, আমাদের এই জলাশয়ের পারে কত ইট, বালি, পাথর জমা হয়েছে। মনে হয় কে যেন কী বানাবে।

গণেশ: আর বলিস না ভাই, তুই তো সেদিন ব্যস্ত ছিলি। বিকেলে মাঠে দু'জন লোককে গল্প করতে শুনলাম। ওখানে একটি বহুতল নির্মাণ হবে।

কার্তিক: তা হলে বর্ষার মাটি ভিজে গড়িয়ে আসা নতুন জলের আস্বাদ আর পাব না।

গণেশ: কার্তিক মনে আছে, নির্বাচনের আগে হবু মন্ত্রী কী সুন্দর বলল, পৃথিবী মানুষ তথা সমস্ত জীবের নিশ্চিন্তে বসবাসের জায়গা। শুধু বৃষ্টির জল নয়, সমস্ত জলাভূমি, বনভূমি সংরক্ষণ করতে হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

কার্তিক: এই তো সেদিন স্কুলের 'নির্মল বিদ্যালয় পালন' অনুষ্ঠানে 'দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর' এখনও আমার কানে বাজছে। এরা কবে মানে বুঝবে জানি না।

গণেশ: চিন্তা শুধু আমাদের নিয়ে নয়। লাখো ছোট গ্রামের নিজস্বতা থাকবে তো?

কার্তিক: ক্ষুদ্র জলাশয় জীবনে আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আন্দোলনে নামতেই হবে। পাশে চাই শুভবুদ্ধির মানুষদের।

গণেশ: খুবই চিন্তা হয় আমরা পারব কি পৃথিবীর জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলতে।

কার্তিক: আমাদের পারতেই হবে।

সায়নী বন্দ্যোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি, গোদাপিয়াশাল চারুবালা গার্লস হাই স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

দ্বিতীয়

কীরে তেলু (তেলাপিয়ার ডাক নাম) কেমন আছিস?

:তা কি আর ভাল আছি গো শোলুকাকা (শোলমাছ)। মানুষ তো আমাদের মেরে-মেরে কুপোকাত করে দিয়েছে।

:সাধে কী বলে মাছে-ভাতে বাঙালি!

:এই যে সেদিন রহুপিসি (রুইমাছ) বলছিল মর্নিংওয়াক করতে বেরছে। ওই থলথলে ভুঁড়ি নিয়ে। কতবার বললাম, যেও না, যেও না। কে শোনে কার কথা! তারপর দুপুর পর্যন্ত ফেরার নাম নেই। মৎস্যনগর পুলিশ স্টেশনে একটা ফোন করলাম। দারোগাবাবু নাকি তখন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন।

: অ্যাঁ, যেই সর্ষের তেল দিয়ে আমাদের ভাজা হয়, সেই সর্ষের তেলই নাকে লাগিয়ে ঘুমোচ্ছে! ঘুমোতে-ঘুমোতেই যে ভাজা হয়ে যাবে রে।

:হ্যাঁ, এদিকে রহুপিসিকে তো মানুষে খেয়েছে।

:তবে জেলেরা আমাকে যতই লোভ দেখাক, ধরতে পারবেনি।

:আমাকে ধরবে? অ্যাঁ, এই তেলুশর্মাকে ধরতে এলে নিজেই জলে পড়ে যাবে আর তাকে চুবিয়ে এনে এখানে আটকে রাখব।

:জান শোলুকাকা, আমাদের জিওগ্রাফি বইতে লেখা আছে যে আমাদের নীচে যেই পাহাড়গুলো আছে সেগুলো নাকি...

:জানি বাবা জানি, সেগুলো পাহাড়ের চুড়ো।

:তুমি আমায় বলতে দিলে না ভ্যাঁ! আমি মাকে বলব ভ্যাঁ! তুমি খুব বাজে। মা, ও মা দেখো না!

:অত চেঁচাস নে, মাছ ধরার দল শুনতে পেলে রক্ষে থাকবে নে!

ঋদ্ধিজিৎ রায়
তৃতীয় শ্রেণি, পাঠভবন, কলকাতা।

তৃতীয়

প্রায় এক বছর পর দেখা হল এই দুই মাছের।

সলমন: কীরে, তোর তো আজ বছরখানেক দেখা নেই। কোথায় ছিলি?

ভেটকি: অন্য আস্তানার খোঁজে গিয়েছিলাম। দেখছিস না। পান করার মতো জলটা ওই বুদ্ধিমানগুলো দূষিত করেছে। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক বন্ধু এর জন্য মরে গিয়েছে।

সলমন: সেটাই তো দেখছি। কারণটা অত বুঝিনি।

ভেটকি: আরও আছে। বলছি. দেখতে পাচ্ছিস কত প্লাস্টিক নদী ও সমুদ্রের জলে প্রতিদিন মেশাচ্ছে ওই মানুষগুলো।

সলমন: এর জন্যই আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাই না?

ভেটকি: একদম ঠিক বলেছিস। মান আর হুঁশ নিয়েও ওরা কত বেহুঁশ।

সলমন: কী করে ওদের জব্দ করি বল তো?

ভেটকি: চিন্তা নেই, ওরা আধুনিক কালিদাস। নিজেদের মরণফাঁদ নিজেরাই বানাচ্ছে। আমরা নোনা জলের আরও গভীরে চলে যাব।

সলমন: আমিও চলে যাব, যেখানে কোনও মানুষ যায়নি, সেই দেশে।

ভেটকি: আবার দেখা হবে।

সলমন: এখানে নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। বন্ধু বিদায়।

হিমপ্রভ চৌধুরী
অষ্টম শ্রেণি, বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়।

চতুর্থ

একটা মাছের সঙ্গে অন্য মাছের কাল্পনিক কথোপকথন

(একদিন কাতলা পদ্মার দিকে চলল। এমন সময় দেখা ইলিশের সঙ্গে।)

ইলিশ কাতলাকে বলল, "হ্যাঁরে কাতলা, তুই এখানে পদ্মার কী করছিস?"

কাতলা বলল, "শুনলাম পদ্মাতে দূষণ কম, আমাদের ওখানে ভাগীরথীতে দূষণ খুব বেশি, তাই এখানে চলে এলাম।"

ইলিশ বলল, "জানিস, বঙ্গোপসাগরে দূষণ আরও কম। আমি ওখানে গিয়েছিলাম।"

কাতলা বলল, "তা হলে চলে এলি কেন?"

ইলিশ বলল, "ওখানে হাঙর আছে। আমাকে খেয়ে নেবে বলে পালিয়ে এলাম।"

কাতলা বলল, "ও বাবা, তা হলে তো পদ্মাই ভাল।"

ইলিশ বলল, "ওই দ্যাখ একটা নৌকা আসছে। চল-চল গর্তে ঢুকে পড়ি।"

কাতলা বলল, "আমি তো এখানকার কিছু চিনি না।"

ইলিশ বলল, "ঠিক আছে। আমি কিছু গর্ত চিনি। তোকে একটায় ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আমি অন্যটায় ঢুকে পড়েছি।

(সেদিনকার মতো ওদের কথা এখানে শেষ হল)

আলিসা খান
পঞ্চম শ্রেণি, মাধাইপুর জুনিয়র হাই স্কুল, মুর্শিদাবাদ।

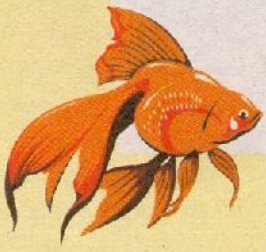

পঞ্চম

সেদিন পাড়ার একটি পুকুর থেকে কুণালকাকু কিছু মাছ ধরে বাবার কাছে বিক্রি করেছিল। তার মধ্যে একটি খলসে মাছ জ্যান্ত ছিল। মাছটা দেখতে খুব সুন্দর, তাই আমাদের বাড়ির অ্যাকোয়ারিয়ামে ছেড়ে দিলাম। অ্যাকোয়ারিয়ামে ছাড়ার পর মাছটা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। আর চিৎকার করে বলছে, "আমায় মুক্তি দাও। এই বদ্ধ জায়গায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।" অ্যাকোয়ারিয়ামের গোল্ড ফিশ তাকে বলছে, "ভায়া আমরা সুখে আছি। কষ্ট করে খেতে হয় না। বড় মাছেরা আমাদের খেতে পারে না। তুমি আমাদের সঙ্গে সুখে থাকতে পারবে।" খলসে মাছ বলে, "স্বাধীনভাবে থাকতে গেলে যদি মরতে হয়, তাও মরব। কিন্তু আমি এই বদ্ধ জায়গায় থাকতে পারব না। চল ভাই, আমরা পালানোর চেষ্টা করি।" এমন সময় মা ডাকছে, "বাবান ওঠ, পড়তে বসবি না?" আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মুছতে-মুছতে অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে গিয়ে মাছগুলোকে দেখে ভীষণ কষ্ট হল। মাছগুলোকে আমি বাড়ির বড় পুকুরে ছেড়ে দিলাম।

অভিনন্দন নাথ
পঞ্চম শ্রেণি, ক্যানিং রায়বাঘিনী হাই স্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

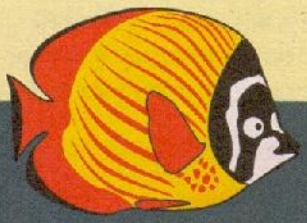

আরও যারা ভাল লিখেছে

শিঞ্জিতা পাল
দ্বিতীয় শ্রেণি, দোলনা ডে স্কুল, কসবা, কলকাতা।

অগ্নিভ দাশগুপ্ত
পঞ্চম শ্রেণি, খসমরা উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া।

শীর্ষা গুপ্ত
ষষ্ঠ শ্রেণি, গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, কলকাতা।

অনুষ্কা দত্ত
সপ্তম শ্রেণি, নব নালন্দা, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

সৃজা মণ্ডল
সপ্তম শ্রেণি, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

রিয়া হালদার
অষ্টম শ্রেণি, অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর।

সৌম্যা চক্রবর্তী
সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা।

কথারূপ জানা
পঞ্চম শ্রেণি, আমতা নিত্যানন্দ হাই স্কুল, হাওড়া।

অমরেশকুমার দে
সপ্তম শ্রেণি, অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, উত্তরপাড়া, হুগলি।

সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণি, কৃষ্ণনগর হাই স্কুল, নদিয়া।

এবারের প্রতিযোগিতা

দুর্গাপুজো তো প্রত্যেকবারেই হয়। এমন কোনও কাল্পনিক পুজোর কথা লেখো, যার কথা কেউ শোনেনি। যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, লিখে পাঠাও ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম ও ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৫ অক্টোবর সংখ্যায় ছাপব। খামের উপর কোন সংখ্যার খুদে প্রতিভা পাঠাচ্ছ, লিখবে এবার থেকে।

ঠিকানা: 'খুদে প্রতিভা', 'আনন্দমেলা', ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

মঙ্গলগ্রহের মাটি

গৌতম রায়

ঝিলিককে এবার বেশ টাইট দেওয়া যাবে। অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোলে ঝিলিক কোনওদিনই বেশি নম্বর পায়নি। শুধু বাংলা আর ইতিহাসে বুম্বার চেয়ে এগিয়ে থাকে ঝিলিক। তবু বুম্বাই ফার্স্ট হয়। কিন্তু প্রতিবারই ইন্টার-স্কুল কম্পিটিশানের আঁকার প্রতিযোগিতায় ঝিলিক প্রাইজ় আনবে। বুম্বা ঝিলিকের চেয়ে পাঁচ-সাতজনের পিছনে থাকবে। সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে বুম্বাকে। আর বাড়ি ফিরলে সবাই বলে, "দুঃখ করিস না বুম্বা, প্রাইজ়টা তো বাড়িতেই এল। আর্ট-

সেন্সটা ঝিলিকের সত্যিই ভাল। কী বলো?"

সকলে বুম্বাকে শুধু সান্ত্বনা দেবে। আগামিকাল আঁকার প্রতিযোগিতা আছে। আর ঝিলিকের একুশ কালারের নতুন প্যাস্টেল বক্সটা বুম্বা লুকিয়ে রেখে এসেছে। নিজের ঘরে, বইয়ের আলমারির নীচের শেল্‌ফে। পুরনো খাতাপত্রের একেবারে পিছনে। খুঁজেও পাবে না ঝিলিক। বোঝ এবার। প্র্যাকটিস করতে পারবি না। কাল কেমন আঁকিস দেখা যাবে।

চওড়া বারান্দাটার গ্রিল ধরে বুম্বা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর এসব কথাই ভাবছিল। আকাশ থেকে চোখ নামাতে, দেখল একটা লোক তাদের সদর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর মিটমিট করে হাসছে। লোক মানে খুব বয়স্ক মানুষ নয়। ফটিকদার থেকে একটু বড়। কিন্তু বিলুকাকুর চেয়ে ছোট হবে।

"কী বাবু, কী ভাবছিলে আকাশের দিকে তাকিয়ে?" বলতে-বলতেই গেট খুলে লোকটা বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছিল। যেন তাদেরই পরিচিত কেউ।

কিন্তু লোকটা তাকে 'বাবু' ডাকল কেন? বুম্বার নাম বাবু নয়। কেউ তাকে কোনওদিন বাবু বলে ডাকেনি। বুম্বা জানে, বাচ্চাছেলেদের অনেকেই 'বাবু' বলে ডাকে। কিন্তু বুম্বা তো আর বাচ্চা নয়। তবু সকলে তাকে বাচ্চা ভাববে কেন? বেশ গম্ভীরভাবেই বুম্বা জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই আপনার?"

"ওব্বাবা। তোমার নাম তো বুম্বা?" বারান্দার দরজার সামনে এসে লোকটা বলল, "বুম্বাবাবু তো বেশ বড় হয়ে গিয়েছ!"

ওদের কথাবার্তা বোধ হয় ঠামা শুনতে পেয়েছিল। ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঠামাকে দেখেই লোকটা বলে উঠল, "মাসিমা, স্যার নেই?"

জানলার ফ্রেম থেকে চাবি তুলে ঠামা বারান্দার দরজাটা খুলে দিল। বলল, "বোসো। উনি ব্যাঙ্কে গিয়েছেন। এখুনি এসে পড়বেন," ঠামা আবার ভিতরের ঘরে ঢুকে গেল।

ঠামার দিকে তাকিয়ে লোকটা কেমন যেন হাসল। তারপর বুম্বার পাশে বারান্দায় পাতা সোফাটার উপর এসে বসে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, "তারপর...কোন ক্লাসে পড়ো বুম্বাবাবু?"

বুম্বা ভাল করে তাকাল লোকটার দিকে। কাঁধে বোলানো চামড়ার ব্যাগ। চকোলেটের মতো গায়ের রং। টিয়াপাখি নাক। নাকের নীচে একটা চওড়া গোঁফ আছে। ঝোলানো। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বুম্বা বলল, "তুমি আমাকে চেন?"

সেই মিটমিট হাসছিল লোকটা। বলল, "আমি যত প্রশ্ন করেছি, তুমি কিন্তু তার এটারও উত্তর দাওনি। বরং প্রশ্নই করে যাচ্ছ..."

লজ্জা পেল বুম্বা, "আমি তো তোমাকে চিনতে পারছি না। অথচ তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকছ..."

"তোমার স্কুলের নাম অরিত্র বসু। দাঁড়াও," বলে লোকটা চোখ বুজে কিছু একটা চিন্তা করল। তারপর বলল, "ঠিকঠাক হলে তুমি এখন ক্লাস এইটে উঠেছ। এই জানুয়ারিতে। কী? ঠিক বললাম?"

"তার মানে তুমি আমাকে চেন।"

"চিনিই তো। তবে তোমাকে ঠিক আট বছর আগে দেখেছি। তুমি তখন কিন্ডারগার্টেনে পড়তে।"

লোকটাকে ভালই লাগছিল বুম্বার। বেশ মজার লোক তো।

এই সময় ঘরের ভিতরে, ঝিলিক আর কাকিমা বেশ চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল। ঝিলিকটাই বেশি চেঁচাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওরা প্যাস্টেলের বাক্সটা খুঁজে পাচ্ছে না। বুম্বার বেশ মজা লাগছিল। পাশ থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কই, বললে না তো। তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিলে?"

আর একটু হলে বলে ফেলতে যাচ্ছিল বুম্বা কথাটা। প্যাস্টেলের বাক্সটার কথাই ভাবছিল তখন ও। চেপে গেল। এসব কথা কি কারওকে বলা যায়? ও বলল, "না, কিচ্ছু না। শুধু আকাশ দেখছিলাম..."

"তা হয় না," লোকটা এখনও সেই হাসছে, "মানুষ জেগে থাকলে কিছু না-কিছু ভাববেই। মন তো কিছুতেই ভাবনা ছাড়া থাকে না!"

বাহ। বেশ মজার কথা তো। এভাবে তো ভেবে দ্যাখেনি বুম্বা কোনওদিন। কিন্তু এসব কথা এড়িয়ে যেতে হবে। কখন বেফাঁস প্যাস্টেলের প্যাকেটের কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করো?"

কাঁধের ভারী ব্যাগটা সোফার উপর নামিয়ে রাখল লোকটা। তারপর বুম্বার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বলি বলো তো তোমাকে? মনে করো খাবার তৈরি করি।"

"সে আবার কী কথা? তুমি কি রান্না করো নাকি?"

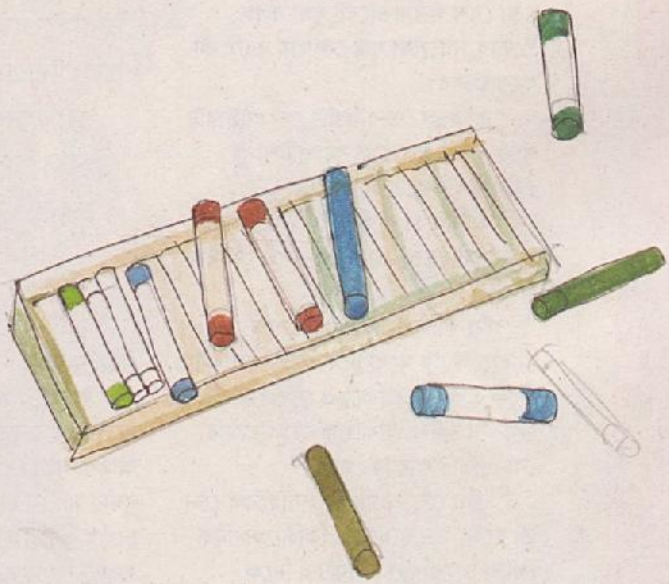

"না, সেরকম নয়। আবার অনেকটা তাইই," লোকটা পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে বলল, "মনে করো কেউ চাঁদে যাবে। তাদেরও তো খাবারের প্রয়োজন হয়। এই তোমার আমার মতো খাবার তো আর, রকেটে করে তাদের জন্য পাঠানো যায় না। অনেকদিনের খাবার নিলে রকেট ভারী হয়ে যাবে। খাবার খারাপ হয়ে যেতে পারে।

মহাশূন্যে শরীর সে খাবার নাও নিতে পারে। তাই তাদের উপযুক্ত করে, হালকা শুকনো ট্যাবলেটের মতো খাবার তৈরি করতে চেষ্টা করি আমি।"

"তার মানে! তুমি ইসরোয় কাজ করো?"

"ও ব্বাবা। তুমি ইসরোও জান?"

"হ্যাঁ, আমাদের পূর্ব গোলার্ধের সবচেয়ে বড় মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র," বই থেকে যেন মুখস্থ বলল বুম্বা।

"হ্যাঁ, তবে আমি ঠিক ইসরোতে কাজ করি না। ওদেরই শাখা অফিস আছে বিভিন্ন জায়গায়। আমাদের ঘুরে-ঘুরে কাজ করতে হয়। এখন আমি পুণেতে আছি।"

এই সময় ঝিলিক এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, "এই বুম্বা, আমার প্যাস্টেলের বাক্সটা কোথায় জানিস?"

ঝিলিকটা কিছুতেই দাদা বলবে না। অথচ বুম্বা ঝিলিকের চেয়ে তিন মাসের বড়। বেশ গম্ভীরভাবেই বুম্বা বলল, "তোর প্যাস্টেল বক্স কোথায় আমি কী করে জানব?'

"তা হলে তোর বক্সটা দে। আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না। কাল কম্পিটিশান। প্র্যাকটিস করতে হবে।"

"আমি তো রঙে আঁকি না। আমার পেনসিল স্কেচ। মোম পেনসিল কোথায় পাব?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, হাত-পা নেড়ে, ঝিলিক আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না। অথচ লোকটা বলল, "ঝিলিক না? তোমার বোন তো? কাকার মেয়ে?"

"তুমি তো আমাদের সবাইকেই চেন তা হলে," চলে যাওয়া ঝিলিকের দিক থেকে ফিরে বুম্বা লোকটার দিকে তাকাল, "তোমার নাম কী?"

"বলব। একটু পরই বলব," লোকটা বুম্বার কাঁধে হাত রাখল, "শোনো বুম্বাবাবু। তোমাকে আমার বেশ ভাল লাগছে। তুমি কিন্তু কী ভাবছিলে, সেটা আমাকে এখনও বলোনি। আচ্ছা, এবার বলো তো বড় হয়ে তোমার কী করতে ইচ্ছে করে? না, স্কুল এগজ়ামের প্রশ্ন নয়। তোমার মনের কথাটা বলো।"

কী করতে ইচ্ছে করে! কী করতে ইচ্ছে করে বুম্বার? না, বেশি ভাবতে হল না। বলল, "আমি মঙ্গল গ্রহে যাব," বলেই চুপ করে গেল।

সত্যিই বুম্বার মনে হয় সে স্পেসশিপে চড়ে গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকে দ্বীপের মতো কত গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র ভাসছে। সামনে আসছে। দূরে চলে যাচ্ছে। কোনওটা সবুজ, কোনওটা হলুদ, কোনওটা কমলা। ইচ্ছেমতো যে-কোনও গ্রহ-নক্ষত্র সে ঘুরে বেড়িয়ে দেখে নিতে পারবে। এসব কথা অ্যান্সার শিটে লেখা যায় না। কাউকে বলাও যায় না। কিন্তু কেন লোকটাকে হঠাৎ এই কথাটা বলে ফেলল। ওই ইসরোর কথা উঠেছিল বলে! মনে-মনে সাবধান হল বুম্বা। লোকটা হয়তো তাকে বোকা ভাববে।

সত্যিই বুম্বার মনে হয় সে স্পেসশিপে চড়ে গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকে দ্বীপের মতো কত গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র ভাসছে। সামনে আসছে। দূরে চলে যাচ্ছে। কোনওটা সবুজ, কোনওটা হলুদ, কোনওটা কমলা।

চোখ নামিয়ে নিল মাটির দিকে।

"লজ্জা পাচ্ছ কেন? ঠিকই তো বলেছ। এত বড় ব্রহ্মাণ্ড পড়ে রয়েছে। আমরা ঘুরে দেখব না!" কাঁধের থেকে বুম্বার মাথায় হাত উঠে গেল লোকটার, চুলের ঝুঁটিটা আলতো করে নেড়ে দিয়ে বলল, "দ্যাখো, আমারও ছেলেবেলায় এরকম সব ইচ্ছে হত। মনে হত, তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে চলে যাব। পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। পক্ষীরাজ বা তেপান্তর পাইনি বটে, কিন্তু তার চেয়ে আরও বড় মাঠ তো আমি পেয়ে গিয়েছি। বলো, ঠিক কি না?"

এই সময় দাদু সদর গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। আর লোকটাকে দেখেই বলে উঠল, "কী রে জগাই। কবে এলি কলকাতায়?" বলতে-বলতে দাদু বারান্দায় উঠে এসেছিল। লোকটা উঠে দাদুকে প্রণাম করল।

"এই তো এলাম। পরশুদিন রাতে ফিরেছি।"

"তুই দোনোমা না কোথায় গিয়েছিলি না? কাগজে দেখছিলাম। ওখানকার ইউনিভার্সিটি তোকে সংবর্ধনা দিয়েছে। কী একটা পুরস্কারও পেয়েছিস পড়লাম।"

"হ্যাঁ স্যার। তানজ়ানিয়ার রাজধানীতে ছিলাম গত মাসে। আমার রিসার্চ পেপারের ওরা খুব সুখ্যাতি করল," লোকটা লজ্জা-লজ্জা মুখ করে হাসল। এই লোকটার নাম জগাই! বুম্বা অবাক চোখে দেখছিল লোকটাকে।

দাদু বলল, "তা তোর মাসিমার সঙ্গে দেখা করেছিস?"

"হ্যাঁ," এবার খোলামেলা হাসছিল লোকটা, "তবে মনে হয় চিনতে পারেননি মাসিমা আমাকে..."

দাদু চোখ কুঁচকে লোকটার দিকে দেখল কিছুক্ষণ, "তোর মতো বিচ্ছুকে চিনতে পারবে না মাধবী! তাই কখনও হয়? দাঁড়া আমি আসছি। কই গো, শুনছ জগাইকে নাকি তুমি চিনতে পারনি?" বলতে-বলতে দাদু ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল।

বুম্বা জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম জগাই?"

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল, "সায়ন সরকার। তবে তুমি আমাকে জগুকাকু বলে ডাকতে পার।"

"তুমি কি 'দোনোমো' মানে দিনেমারদের দেশে গিয়েছিলে?"

"দুর বোকা। ডেনমার্কের মানুষদের দিনেমার বলে। আমি তো তানজ়ানিয়ায় গিয়েছিলাম। বললাম না, 'দোনোমা' হল তানজ়ানিয়ার রাজধানী।"

ঠামা আর দাদু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঠামা এসে জগুকাকুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "তা এরকম বাবরি চুল, আর ঝুপো গোঁফ নিয়ে লোক-লোক হয়ে এতদিন পরে এলে চিনব কেমন করে? তা ছাড়া তখন তোকে ভাল করে দেখিওনি। কত মানুষই তো দিন-রাত ওঁর কাছে আসছে। তারপর ভাল আছিস তো?"

জগুকাকু উঠে ঠামাকে প্রণাম করল।

বলল, "মাসিমা, আপনার হাতের নারকেল নাড়ু কিন্তু এবার একদিন এসে খেয়ে যাব।"

"আছে। করাই আছে। বোস, একটু পরে এনে দিচ্ছি," ঠামা বলল, "তা এতদিন পরে কী মনে করে। আবার কী কিছু দুষ্টুমি করবি!"

ঠামা বোধ হয় জগুকাকুর দুষ্টুমির কিছু উদাহরণ দিতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দাদু বলল, "আরে, ও কি আর এখনও সেরকম আছে নাকি? কত বড় সায়েন্টিস্ট হয়েছে জান।"

জগুকাকু মুখটা নিচু করে বলল, "আমি কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আজ এসেছি। মাসিমা যদি সেটাকে দুষ্টুমি বলেন, তবে দুষ্টুমিই হবে।"

"সেটা আবার কী?" দাদু আবার চোখ কুঁচকে জগুকাকুর দিকে তাকাল। বোধ হয় বুঝবার চেষ্টা করল জগুকাকুর মতলবটা।

"আমি একটা জিনিস এনেছি স্যার আপনার জন্যে। আপনাকে কিন্তু নিতে হবে," কথা বলতে-বলতে জগুকাকু সোফার উপর রাখা নিজের চামড়ার ব্যাগটা খুলছিল। খোলা শেষ হলে, ভিতর থেকে একটা কার্পেপেপারের মোড়ক বের করল। মোড়কটা খোলা হলে বুম্বা দেখল, ছোট্ট শিল্ডের মতো ঝকঝকে একটা জিনিস জগুকাকুর হাতে। ওটা কি সোনা আর রুপো দিয়ে তৈরি না কি?

দাদু বলল, "ওটা কী?"

"এটা তানজানিয়ার কনফারেন্সের স্মারক। পুরস্কারের সঙ্গে দিয়েছে। এটা আপনাকে নিতে হবে।"

"কেন? এটা আমি নেব কেন? এটা তো তোর একটা মূল্যবান সংগ্রহ হবে।"

"স্যার। এটার চেয়েও আমার কাছে অনেক মূল্যবান আপনি। আমার কাছে পুরস্কারটা তো থাকলই। আপনার কাছে এটা থাকলে আমার বেশি আনন্দ হবে," জগুকাকুর চোখদুটো কী ছলছল করছিল, তবু হাসি ছিল মুখে। বলছিল, "একদিন অনেক দৌরাত্ম্যি করেছি। আপনি স্নেহ দিয়ে, শাসন দিয়ে তবু আমাদের গড়ে তুলেছেন। গরিব ছিলাম আমরা। প্রাইভেট টিউশনের পয়সা ঠিকমতো জোগাড় করতে পারতাম না। তবু কী যত্ন নিয়ে আমাকে পড়িয়েছেন," চোখে বোধ হয় সত্যিই জল এসেছিল জগুকাকুর। মুখ নিচু করে নিল।

আর বুম্বা দেখল, দাদু কেমন এক অন্য রকম দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে জগুকাকুর দিকে।

আবার মুখ তুলল জগুকাকু। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে একটা ভেজা হাসি হাসল। বলল, "আরও একটা কথা আছে স্যার। এই স্মারকটা হাতে নেওয়া সময় আমার সেই কথাটা মনে পড়েছিল। আর তখনই ভেবেছিলাম এটা আপনার।"

দাদু খুব গম্ভীর ছিলেন। গম্ভীর স্বরেই বললেন, "আবার কী কথা?"

"আপনার দেখানো একটা ম্যাজিকের কথা আমার মনে পড়েছিল সেদিন। ওই ম্যাজিকটা না দেখলে, সেই আমি আজ এই আমি হতে পারতাম না।"

"ম্যাজিক?"

"আপনার হয়তো মনে নেই," কথাটা বলে কিছু একটা ভাবল জগুকাকু। তারপর বলল, "আচ্ছা, ম্যাজিকটা আমি একবার বুম্বাকে দেখাই। তা হলেই আপনার মনে পড়ে যাবে।"

জগুকাকু চামড়ার ব্যাগটা খুলে একটা সাদা ডায়েরি বের করল। তারপর নিজের বুকপকেট থেকে পেনটা খুলে সেই ডায়েরির পাতায় লম্বা ছোট দাগ টানল। এবার ডায়েরিটা বুম্বার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "বুম্বাবাবু, এই লাইনটাকে ছোট করে দিতে হবে। কাটতে পারবে না। ছিঁড়তে পারবে না। পোড়াতে পারবে না। দেখি তো তুমি পার কি না..."

বুম্বা সাদা পাতাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাগটার দিকে তাকিয়ে রইল। সে আবার কী কথা। কাটা যাবে না, ছেঁড়া যাবে না, তা হলে এটাকে কী করে ছোট করা যাবে? কিন্তু নিশ্চয়ই ছোট করা যাবে রেখাটা। না হলে দাদুর সামনে জগুকাকু এভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। ডায়েরির পাতাটা হাতে নিয়ে বুম্বা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। না, মাথাতে কিছুই ঢুকছে না। জগুকাকুর দিকে তাকিয়ে একবার বলল, "আচ্ছা, আমি যদি পাতাটাকে ভাঁজ করি?"

"তা হলে পাতাটা খুললে, আবার তো দাগটা সমান হয়ে যাবে," জগুকাকু হাসল, "তোমাকে দেখাতে হবে যে, রেখাটা ছোট। সবাই মেনে নেবে যে হ্যাঁ রেখাটা ছোট হয়েছে।"

বুম্বা দাদুর দিকে তাকাল। দাদুর মুখটা হাসি-হাসি। দাদু নিশ্চয়ই জানে ম্যাজিকটা। কিন্তু বলবে না। বুম্বার রাগ হচ্ছিল। পারছে না। কিছুতেই পারছে না। অথচ নিশ্চয়ই ছোট করা যাবে দাগটা। মনে হচ্ছে সোজা। এত সোজা বলেই বোধ হয় গুলিয়ে যাচ্ছে ম্যাজিকটা।

জগুকাকু বলল, "পারবে না তো? ঠিক আছে, আমিই তা হলে দেখিয়ে দিই।"

"না, দাগটাকে যদি সত্যিই ছোট করা যায়, আমি পারব না কেন?" বুম্বাও কম জেদি নয়। বুম্বার ভিতরের জেদ প্রকাশ পেল ওর চোখে-মুখে। ডায়েরির পাতায় মুখ গুঁজে চুপ করে বসে থাকল অনেকটা সময়। কাটা যাবে না। ছেঁড়া যাবে না। ইরেজার দিয়ে মোছা যাবে না। একটা সাইডও পুড়িয়েও দেওয়া যাবে না। কী করে ছোট করা সম্ভব রেখাটাকে। ডায়েরির পাতায় চোখ ছিল বুম্বার। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিল দাদু, ঠামা, জগুকাকু সবাই ওর দিকে তাকিয়ে বেশ মজা পাচ্ছে। কোনও পাজল সলভ না হলে বুম্বার মাথা গরম হয়ে যায়। মাথাটা সত্যিই ব্যথা করছিল। এত সোজা, অথচ পারছে না। নাহ, পারছে না। সত্যিই পারল না। বলল, "ম্যাজিক বলছ যখন, নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারচুপি আছে। এটা কোনও অঙ্কের পাজল নয়। তা হলে আমি করে দিতাম।"

"কোনও ম্যাজিক নয়। একেবারে হিসেবের জিনিস। অঙ্কেরই মতো। সবাই বলবে হ্যাঁ, ছোট হয়ে গিয়েছে রেখাটা," জগুকাকু হাসছিল। পাশে দাঁড়িয়ে দাদুও হাসছিল শব্দ না করে।

বুম্ব আবার নিবিষ্ট হল পাতার দাগটার দিকে। নাঃ, হচ্ছে না। পারল না বুম্বা। হেরে গেল।

জগুকাকু এবার ওকে কোলে তুলে নিল, "দুঃখ কোরো না বুম্বাবাবু। তোমার মতো বয়সে আমিও পারিনি।"

তারপর বুম্বার হাত থেকে ডায়েরিটা নিয়ে, ওই লাইনটার পাশে আরও একটা লম্বা লাইন টেনে দিল। যেটা আগের দাগটার চেয়ে বেশ বড়।

"কী? তোমার রেখাটা ছোট হয়ে গেল তো!" বুম্বাকে কোল থেকে নামিয়ে দাদুর দিকে তাকাল জগুকাকু, "স্যার, আপনার হয়তো মনে নেই স্কুলের স্পোর্টসে ফণীকে বিট করার জন্য দৌড়ের ট্র্যাকে আমি মাঝপথে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিলাম। দুষ্টু ছিলাম তো। জানতাম ও দৌড়লে আমি পারব না। পরে ক্লাসে এসে আপনি আমাকে এই ম্যাজিকটা দেখিয়েছিলেন। বলে ছিলেন, 'কারওকে ছোট করে বড় হওয়া যায় না। ফণী জিততে পারেনি বটে, তুই কিন্তু জানিস ও তোর চেয়ে বড়। তার

আপনার হয়তো মনে নেই স্কুলের স্পোর্টসে ফণীকে বিট করার জন্য দৌড়ের ট্র্যাকে আমি মাঝপথে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিলাম। দুষ্টু ছিলাম তো। জানতাম ও দৌড়লে আমি পারব না। পরে ক্লাসে এসে আপনি আমাকে এই ম্যাজিকটা দেখিয়েছিলেন।

মানে তুই নিজের কাছে ছোট হয়ে গেলি। নিজের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার থেকে লজ্জার আর কী আছে বল। তার চেয়ে নিজেকে বড় করে তোল। দেখবি আনন্দ পাবি। তবে সকলের শক্তি তো আর এক জায়গায় নয়। ফণীর শক্তি খেলার মাঠে আছে। তোরও নিশ্চয়ই শক্তি আছে জগাই। অন্য কোথাও আছে। খুঁজে দ্যাখ।' জগুকাকু মাথাটা নিচু করে নিল। তারপর আবার বলল, "সেই দিন থেকে আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আমার শক্তি কোথায়। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, আর ম্যাথসে, আমার স্কুলে আমাকে কেউ বিট করতে পারবে না। আমি ডুবে গেলাম বিজ্ঞানে। সেই থেকে আমার দৌড় শুরু। তাই তানজানিয়ায় এই স্মারকটা হাতে প্রথমেই আমার আপনার কথা মনে পড়েছিল।"

এবার দাদু জগুকাকুকে জড়িয়ে ধরল, "পড়িয়েছি তো আরও অনেককেই। অনেক কথাও বলেছি। কিন্তু যে সেটাকে কাজে লাগাতে পারে তারই জয়। তুই আরও লম্বা দৌড়ের ঘোড়া জগাই।"

এর পর একে-একে কাকিমা এল, কাকাই এল, মা এল। দেখল, সবাই জগুকাকুকে চেনে। ভালবাসে। শুরু হল ছেলেবেলার জগাইয়ের ডানপিটেগিরির গল্প। হাসিঠাট্টা, হইচই, গপ্পো-গুজবে সবাই মজে গেল। কিন্তু বুম্বা কেমন যেন গুম মেরে গেল। চুপচাপ বসে থাকল। কোনও কথা বলছিল না। ওই আশ্চর্য ম্যাজিকটার কথাই ভাবছিল। কী সোজা। অথচ...একসময় দেখল, ঝিলিকও এসেছে সেখানে। বুম্বা আস্তে-আস্তে উঠে পড়ল সেখান থেকে।

নিজের ঘরে এল বুম্বা। বইয়ের আলমারির নীচের শেলফ থেকে প্যাস্টেলের বাক্সটা তুলে নিল। তারপর চুপিচুপি ঢুকল ঝিলিকের ঘরে। যেখানে ছিল, বাক্সটা সেই টেবিলের উপর রেখে দিল। আবার ফিরে এল বারান্দায়। ভিড়ের থেকে দূরে গ্রিল ধরে দাঁড়াল। আকাশই দেখছিল বুম্বা। পিছন থেকে জগুকাকু এসে ওর কাঁধে হাত রাখল, "আরে বুম্বাবাবু, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ঝিলিকের গিফট তো দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তোমাকে খুঁজছি।"

বুম্বা দেখল, এবার চলে যাবে জগুকাকু। ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে। আবার ব্যাগ খুলে জগুকাকু একটা সুন্দর ভিডিয়ো গেম বের করল। বুম্বার হাতে দিল। বলল, "আমি তো তোমাকে গেম দিলাম। আমার রিটার্ন গিফ্‌ট কী? একটা পাপ্পি তো!" নিচু হয়ে বুম্বার সামনে এগিয়ে দিল নিজের গালটা।

বুম্বা জগুকাকুর গালে একটা চুমো খেল। বলল, "কিন্তু তোমার রিটার্ন গিফ্‌টটা পাওনা রয়ে গেল।"

"কী সেটা?"

বুম্বা গম্ভীর হয়ে বলল, "তোমাকে আমি মঙ্গল গ্রহের মাটি এনে দেব।"

হেসে সোজা হয়ে দাঁড়াল জগুকাকু। বুম্বার পিঠটা চাপড়ে দিল আলতো করে। বলল, "গুড!"

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি

শিঞ্জিনী সাহা

পঞ্চম শ্রেণি, ডি এ ভি মডেল স্কুল, আসানসোল।

অরিন সাহা

দ্বিতীয় শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম, রহড়া

আমার লেখা

সৌমিল মুখোপাধ্যায়

পঞ্চম শ্রেণি, সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল, কলকাতা।

আমি টাইম মেশিনসহ জুরাসিক পিরিয়ডে চলে এসেছি। দূরে পাহাড় থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল এখানে। চারপাশের আওয়াজ শুনে মনে হয় কোন জগতে চলে এলাম আমি? হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে ডান দিকে ঘুরে দেখি, ট্রাইসেরাটপসের পরিবার। প্রকাণ্ড স্তন্যপায়ী প্রাণী। হাতির মতো সাদা প্যাঁচালো শিং। গলার জায়গায় গোলমতো চামড়া, হাতির মতো মস্ত পা। দেখলে নিরীহ বলে মনে হয়। ছোট্ট দুটো চোখ দিয়ে আমায় দেখল। তারপর খোলা মাঠে চলে গেল। পাহাড় থেকে নেমে লক্ষ করলাম চারটে ব্রাচিয়োসরাস এবং পাঁচটি পেট্রোড্যাক্টিল জল খাচ্ছে। এসব দেখে আমি ভয়ে ঠান্ডা। টাইম মেশিনে ফিরে গিয়ে দেখি, চারটে র‍্যাপটর সেটা ভেঙে ফেলেছে। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে তারা পালাল। একটা প্রকাণ্ড ছায়া আমাকেও ছাড়িয়ে টাইম মেশিনের গায়ে পড়ল। পিছনে ফিরে দেখি, এ যে টিরানোসরাস রেক্স। ও বাব্বা! ভয়ে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি আর ও এগিয়ে আসছে। আচমকা দুম করে একটা আওয়াজ হল আর ও মুখ থুবড়ে পড়ল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

আমার ছবি

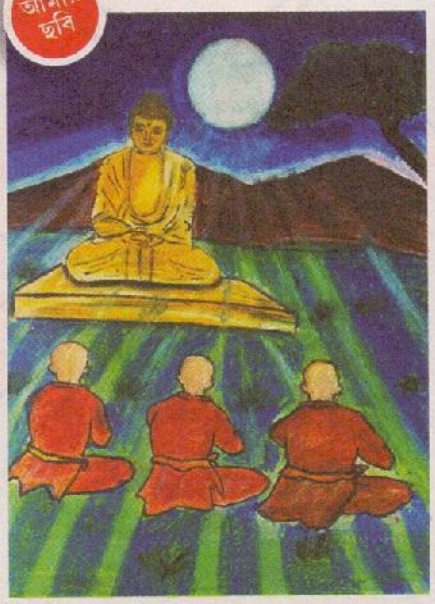

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও।

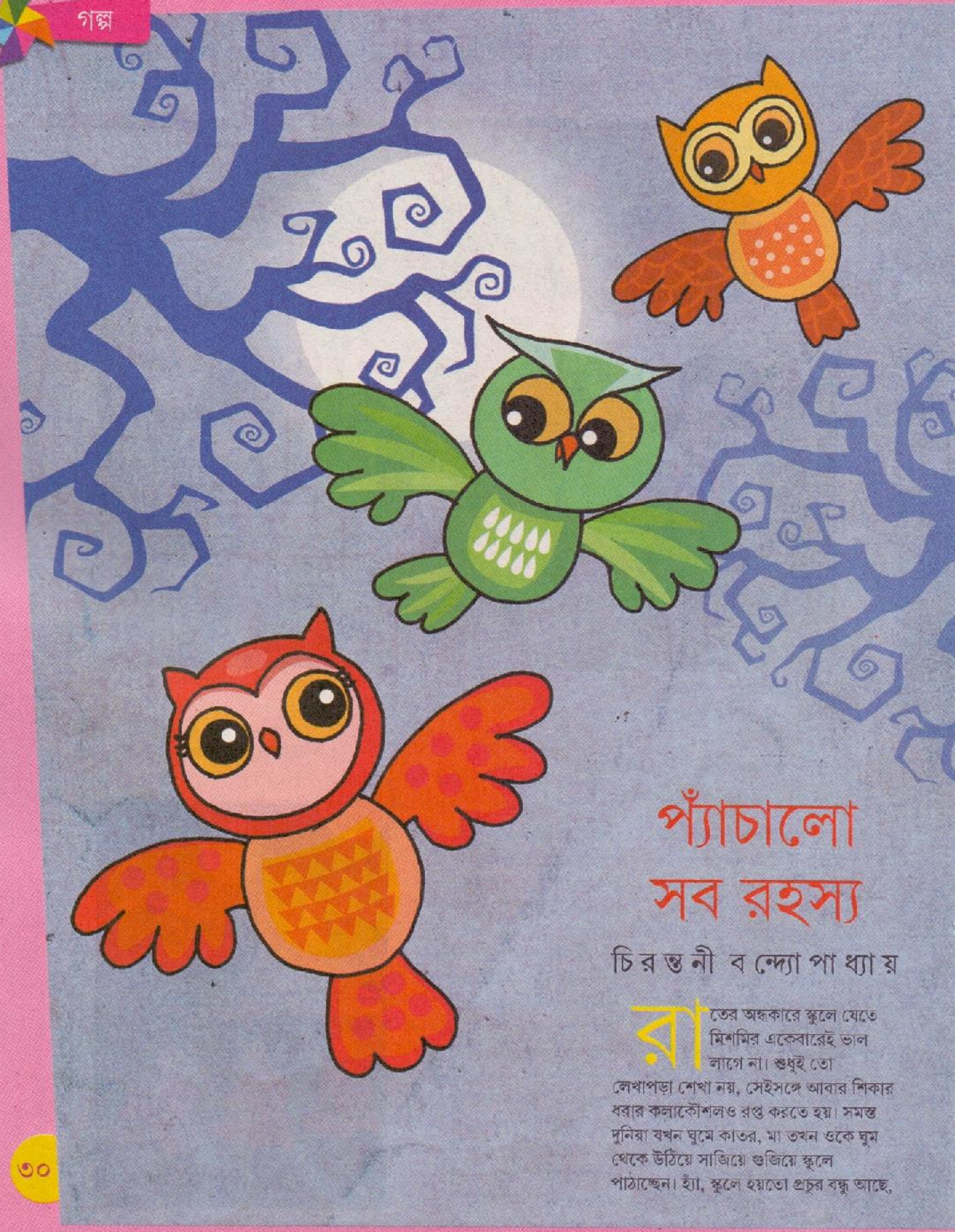

প্যাঁচালো সব রহস্য

চিরন্তনী বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতের অন্ধকারে স্কুলে যেতে মিশমির একেবারেই ভাল লাগে না। শুধুই তো লেখাপড়া শেখা নয়, সেইসঙ্গে আবার শিকার ধরার কলাকৌশলও রপ্ত করতে হয়। সমস্ত দুনিয়া যখন ঘুমে কাতর, মা তখন ওকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। হ্যাঁ, স্কুলে হয়তো প্রচুর বন্ধু আছে,

তারা তো সবাই প্যাঁচা বন্ধু! এটাই ওর ভাল লাগে না। আরও তো কত পাখি আছে, আরও তো কত প্রাণী আছে, যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারত! তার উপর প্রাণিজগতের 'শ্রেষ্ঠ জাত' নাকি মানুষ, তাদের মধ্যেও তো দু'-একটা বন্ধু হতে পারত। সব কিছু মাঠে মারা গেল এই রাত জাগা তকমাটা জন্য।

মায়ের সামনে হুট করে কিছু বলাও যায় না। মাকে একা শিকার করে সংসার চালাতে হয়। তাও একবার এই ভাল না লাগার কথাটা মাকে বলেছিল ও। মা কিন্তু শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। মা নাকি চান না ওর অন্য কোনও বন্ধু থাকুক। কী না, মিশমির বাবা অনেককাল আগে হারিয়ে যান অন্য প্রাণীর চক্করে। মা জানেনও না বাবা এখন কোথায়, আদৌ বেঁচে আছেন কিনা। এসব জানার পর মিশমির সত্যিই খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে এই রাত জাগা পাখির তকমা নিয়ে একঘরে হয়ে থাকাটাও পোষায় না।

স্কুলে আজকাল শিকারের পাশাপাশি মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য ক্যারাটে, কুংফু শেখানো হচ্ছে। এসবের প্রয়োজন ঠিক কী মিশমি তা বোঝে না। এছাড়া শিকারের কলাকুশলীর উপর থিয়োরি আর প্র্যাকটিক্যাল দু'রকম ক্লাসই হয়। আর সপ্তাহের শেষে আবার 'পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্ত' আকারে প্রোজেক্ট জমা দিতে হয়। এই প্র্যাকটিক্যালগুলো আবার মিশমির বেশ ভাল লাগে। এই সমাজে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে শিকারে সবাইকে সমান পারদর্শী হতে হয়। মিশমিরা যেমন বাড়িতে মাছ শিকার করে খায়, তেমনি অনেক প্যাঁচা আছে যারা ছোটখাট পোকামাকড়, ইঁদুরটিদুর শিকার করে খায়। স্কুলে মোটামুটি সব শিকারেরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যে শিক্ষকমশাই প্রশিক্ষণ দেন, তাঁর নাম দ্রোণ। ক্লাসের সবজান্তা ছেলে ডিংকা। ওর সব বিষয়েই অনেক জ্ঞান, ও বলেছে, দ্রোণ নাকি ভারতীয় মানুষদের মহাকাব্যের একটি চরিত্র। তিনিও নাকি এরকমই তীর-ধনুক চালানোর প্রশিক্ষণ দিতেন। আশ্চর্য! এই প্যাঁচাদের মধ্যে যে কীভাবে মানুষের নাম আসে, মিশমি ভেবে পায় না।

মিশমি, ডিংকা আর জুলু বেশ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। এখানে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে নির্ভেজাল বন্ধুত্ব হয়। মায়ের এই নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু মেয়ের মানুষ বন্ধু করার কথা ভাবা নিয়ে। তাই ভোরের আলো ফুটতে দেখা গেলেই ওকে জাপটে ওর মা ঘুমিয়ে পড়েন। আর ও ভাবতে থাকে, এইভাবে তো কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সকালে না জাগলে, না ঘুরলে ফিরলে, না লোকজনের সঙ্গে মিশলে বাবার খোঁজ করবে কীভাবে? বাবা যদি সত্যিই বেঁচে থাকেন, যদি একা বাড়ি ফেরার মতো অবস্থায় না থাকেন, তাঁকে তো ফিরিয়ে আনতেই হবে। তার জন্যও তো জনসংযোগ বাড়াতে হবে।

কী আর করা যাবে, কাকে আর ও বোঝাবে এসব! এর মধ্যে একদিন শিকার ধরার ক্লাসে ছ' সেকেন্ডের মধ্যে উড়ে গিয়ে একটা জ্যান্ত ইঁদুর ধরে ফিরে এল ডিংকা। মিশমির আগেই হয়ে গিয়েছে। জুলু কিছুতেই গেল না। কী না, ওর এইসব জ্যান্ত পশু শিকার করতে বড্ড অসুবিধে হয়। কসরত বেশি হয়ে যায়। মরা ইঁদুর ধরে খাওয়াটা অনেক বেশি আরামের। ডিংকা আর মিশমি ওকে শত উদ্বুদ্ধ করলেও ও যায় না। মিশমি ওদের কাছে গল্প করে ওর বাবার হারিয়ে যাওয়ার কথা, ওর মানুষ-বন্ধু করার ইচ্ছের কথা। সর্বজ্ঞানী ডিংকা লাফিয়ে উঠে বলল, "না-না খবরদার। মানুষ আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আমি একটা বইয়ে পড়েছি, ওরা সবাই আমার শত্রু। গাছ কেটে-কেটে আমাদের বাড়ি, ঘর সব ধ্বংস করেছে। শুধু তাই নয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং না কী যেন একটা বলে, সেইসবও করেছে ওরা। সারা পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে। আর সারা পৃথিবীতে যত

বরফ আছে সব আইসক্রিমের মতো গলে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আর আমরা কেউই বাঁচব না।"

মিশমি তো শুনেই খুব ভয় পেয়ে বলল, "তাই বুঝি? তুই সত্যি বলছিস? মানুষরা বাঁচবে না ঠিক আছে, কিন্তু আমরা প্যাঁচারও বাঁচব না?"

জুলু বলল, "তা নয়তো কী? মরলে সবাই মরব রে। আর তুই তো ভালই জানিস মানুষ তোর বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তারপরেও তুই এসব ভাবিস কী করে?"

এর পর একদিন কী যে ঘটে গেল! ওরা তিনজন ডানায় ভর করে ফিরছিল। হঠাৎ জুলু বলল, "ওই দ্যাখ, রাস্তায় একটা মরা ইঁদুর," বলেই শোঁ করে নীচে নেমে কপাকপ খেয়ে ফেলল। তারপর উড়ে এসে বলল, "খিকখিক। তোরা ওই কায়দা করে জ্যান্তই ধর। আর আমি..."

ওর কথা শেষ হল না। ডানায় জোর না পেয়ে, উড়তে না পেরে ধপাস করে পড়ে গেল। ওরা নেমে দেখল জুলুর কোনও সাড়াশব্দ নেই। মরে গেল নাকি? সত্যিই জুলু সেদিন মরে যায়। ডাক্তার, বদ্যি, থানা, পুলিশ করে এটাই ধরা পড়ল, ও যে মরা ইঁদুরটা খেয়েছিল সেটা খুব বেশিমাত্রায় বিষ দিয়ে মারা হয়েছিল। ওই বিষ খাওয়া ইঁদুর খেয়ে জুলু মরে গিয়েছে।

ইঁদুরকে বিষ খাওয়াল কে? বিষ খাইয়ে রাস্তায় ফেলল কে? আবার কি সেই মানুষ? নিশ্চয়ই তাই হবে। সবাইকে মারার অধিকার তো ওদেরই আছে। ডিংকা আর মিশমি তো জুলুকে ছেড়ে থাকতেই পারছে না। কথা বলতেও ইচ্ছে হয় না আজকাল। সারাদিন খালি জুলুর সুন্দর দুটো চোখ, সুন্দর মুখ চোখের সামনে ভাসে। ওকে খুব মনে পড়ে। ওদের মনের অবস্থা দেখে দ্রোণ একদিন বললেন, "শোনো তোমরা দু'জন। তোমরা কি জুলুর সঙ্গে কথা বলতে চাও? দেখা করতে পারবে না কিন্তু। শুধুই কথা।"

মিশমি অবাক হয়ে বলল, "কীভাবে?"

দ্রোণ বললেন, "একে প্ল্যানচেট বলে। জুলু আমার মধ্যে দিয়ে কথা বলবে। কিন্তু তার জন্য তোমাদের এই রাতে না, দিনের বেলায় আসতে হবে। সূর্য যখন থাকবে মধ্যগগনে।"

ডিংকা বলল, "কিন্তু স্যার, আমি তো একটা বইয়ে পড়েছি প্ল্যানচেট নাকি সন্ধের অন্ধকারে টেবিলের উপর মোমবাতি জ্বালিয়ে চারপাশে বসে হয়?"

দ্রোণ গম্ভীরভাবে বললেন, "খানিকটা ঠিকই জান। তবে যেসব প্রাণী দিনে জাগে, তারা রাতে প্ল্যানচেট করে। আমাদের ব্যাপারটা হয় উলটো।

ইঁদুরকে বিষ খাওয়াল কে? বিষ খাইয়ে রাস্তায় ফেলল কে? আবার কি সেই মানুষ? নিশ্চয়ই তাই হবে। সবাইকে মারার অধিকার তো ওদেরই আছে। ডিংকা আর মিশমি তো জুলুকে ছেড়ে থাকতেই পারছে না। কথা বলতেও ইচ্ছে হয় না আজকাল। সারাদিন খালি জুলুর সুন্দর দুটো চোখ, সুন্দর মুখ চোখের সামনে ভাসে।

যাই হোক, তোমরা কি আসতে চাও?"

ওরা সমস্বরে বলল, "আসব স্যার। কিন্তু আপনি একবারটি আমাদের গার্ডিয়ানদের বলুন।"

"বলব।"

ঠিক হল দ্রোণের ভিতর দিয়ে জুলু আসবে। অর্থাৎ দ্রোণ হবেন প্ল্যানচেটের মিডিয়াম। তার আগে অবশ্য সবাইকে চোখ বন্ধ করে জুলুর কথা ভাবতে হবে।

মিশমির প্রথম সূর্য দেখা। কত পাখির কিচিরমিচির, ব্যস্ততা, ছোটাছুটি, হুড়োহুড়ি। অনেক দূরে রাস্তাঘাট, গাড়ি-ঘোড়া, ছোট্ট মানুষদের স্কুলে যাওয়ার ঢল। মিশমির তবু আজ কিছুই ভাল লাগছে না। মা আজ নিজে ওকে দ্রোণের বাড়ি নিয়ে এসেছেন। এইবার একটা ঘরে চতুর্দিকে দরজা, জানলা খুলে ঝলমলে আলো আসতে দেওয়া হল। মাঝে একটা টেবিলে দ্রোণ বসেছেন। অন্য দু'ধারে এক দিকে মিশমি, অন্য দিকে ডিংকা। সকলের চিন্তার মধ্যে দিয়ে জুলু এসে উপস্থিত হল দ্রোণের ভিতর। ডিংকাই সব প্রশ্ন করল, "জুলু কেমন আছিস তুই এখন?"

জুলু বলল, "খুব কষ্ট রে! প্রচণ্ড সূর্যের আলো। আমার মতো আরও যত প্যাঁচা ভূত আছে, সবারই খুব অসুবিধে। এত লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, খুব সমস্যা রে! এখন আলোয় ভাল দেখতে পাই ঠিকই, কিন্তু প্রচণ্ড কোলাহল। তারপর সেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং না কী যেন বলেছিলি, সেইসব। আর হ্যাঁ, তোদের খুব একটা জরুরি কথা বলার আছে। মিশমি, তোর বাবা বেঁচে আছেন। ওঁকে একটা চিড়িয়াখানায় খাঁচায় বন্দি করে রাখা আছে। আমি এই কাগজে একটা ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। একদিন গিয়ে দেখে আসিস।"

দ্রোণের হাত দিয়ে খসখস করে কাগজে কিছু লেখা বেরল। তারপর জুলু বলল, "আমিই জাল ভেঙে ওঁকে বের করে আনতে পারতাম। কিন্তু দিনের আলোয় ওখানে প্রচুর লোক। তাই পারিনি। তোরা গিয়ে খাঁচা ভেঙে নিয়ে আসিস। আজ আসিরে। একসঙ্গে এত কথা বলতে খুব কষ্ট হয়। বায়বীয় অবস্থায় থাকা খুব কঠিন। তা ছাড়া এখানে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প'। প্রচুর কসরত করতে হয় রে খাবার জোগাড় করতে। চলিরে। তোরা ভাল থাকিস।"

আস্তে-আস্তে দ্রোণের হুঁশ ফিরে এল। তবুও মিশমি আর ডিংকার অবাক হওয়া হাঁ মুখটা আর বন্ধ হল না। বাইরে কে যেন ডেকে উঠল, "হুট, হুট।"

ছবি: রৌদ্র মিত্র

এখানে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই সংখ্যারই লেখার মধ্যে। বাকি পাঁচটি তোমাদের সাধারণজ্ঞানের পরীক্ষা।

1 মহাশ্বেতাদেবীর 'রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা নামে' নামে যে বইটি তোমরা অনেকেই পড়েছ, সেটি এডওয়ার্ড জেমস করবেটের কোন বইয়ের অনুবাদ?

2 স্ত্রী মশার লালাবাহিত হয়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানী তা প্রথম আবিষ্কার করেন?

3 ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে শতরান, দক্ষ হাতে উইকেটরক্ষার দায়িত্ব সামলানো, নাইট রাইডার্স ও কিংস ইলেভেনের হয়ে টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা ঋদ্ধিমান সাহা এমন কাকে কোচ হিসেবে পেয়েছেন, যিনি বদলে দিয়েছেন ওঁর ব্যাটিংয়ের সমস্ত ধারাপাত?

4 কানাডার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা কানাডার হাউজ অব কমন্স-এর প্রধান পদে বসলেন। তিনি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। বলতে পারবে কী নাম তাঁর?

5 কমেডি ছবিতে অভিনয় করা ছিল উত্তমকুমার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এইরকমই একটা ছবির স্টিল ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। বলতে পারবে ছবির নাম? ছবির কোন জনই বা উত্তমকুমার?

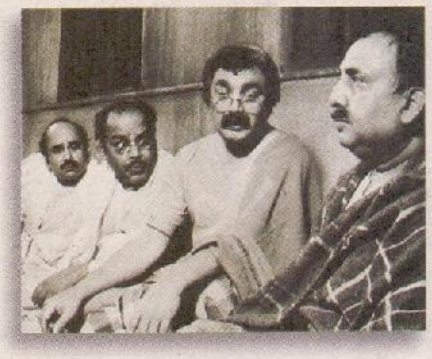

6 শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি ঘোষণা করলেন হিরের আংটিটা যদি কেউ খুঁজে এনে দিতে পারে, তাকে তিনি এক লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দেবেন। কে করেছিলেন এমন ঘোষণা?

7 "মরলে সবাই মরব রে। আর তুই তো ভালই জানিস মানুষ তোর বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তারপরেও তুই এসব ভাবিস কী করে?" কে বলেছিল এই কথা? কাকে?

8 'আমি টাইম মেশিনসহ জুরাসিক পিরিয়ডে চলে এসেছি। দূরে পাহাড় থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে'। কে চলে এসেছে জুরাসিক পিরিয়ডে?

9 মানুষ একা থাকতে চায় না বলেই একসময় থেকে অনেক মিলে দল বেঁধে থাকতে শুরু করেছিল। তার ফলে কী হয়েছিল?

10 "তোমার মাকে বোলো কোনও চিন্তা না করতে। আমি একদম ঠিক আছি।" কে বলছেন? কাকে উদ্দেশ করে?

সুদেষ্ণা বসু

৫ অগস্ট সংখ্যার উত্তর

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২. বৈজ্ঞানিক নাম, কর্ভাস স্পলেনডেন্স। ইংরেজিতে কমন হাউজ ক্রো।
৩. গল্পের গুপী ছিল সহজ-সরল, বাঘা বুঝদার। শুন্ডি রাজা ভাল, খারাপ হল হাল্লা রাজা।
৪. ৫১ কেজি বিভাগে জার্মানির আদিদ নিমানির কাছে।
৫. বৈয়াকরণ বা ব্যাকরণবিদ।
৬. চার ইয়ারি সংঘের সেক্রেটারি পত্রলেখা শিকদারকে। ('পূজা পরিক্রমা' গল্প)
৭. সুপর্ণা সাউ।
৮. 'ঘোড়াসক্তি' গল্পের দাদু বলেছিলেন বিচিত্রমামাকে।
৯. একটা পোকা।
১০. ১৮৪৭ সালে।

সঠিক উত্তরদাতা

জাগরী মুখোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণি, ইন্দা বালিকা বিদ্যালয়, খড়্গপুর।

ঈশা পাঠক
পঞ্চম শ্রেণি, ঝিলিমিলি উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

সালংকারা সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা গার্লস হাই স্কুল, কোচবিহার।

প্রবাহ দাস
অষ্টম শ্রেণি, বেলকুলাই সি কে এ সি বিদ্যাপীঠ, হাওড়া।

উত্তর পাঠাও ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আমাদের ঠিকানা 'আনন্দমেলা আমার কুইজ' বিভাগ। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

রূপকথার মতো

শরদিন্দু কর

মণিরামকে সবাই বলে জলের পোকা। মণিরাম নিজেও তাই জানে। দারুণ উৎসাহে জলে ঝাঁপ দিয়ে সে যখন সাঁতার শুরু করে তখন মনে হয়, সে সাঁতার কেটে অনেক দূরে কোথাও পাড়ি দিতে চায়। জলে নামলে ওর সময়ের হিসেব থাকে না।

বিরাট দিঘি। দিঘির প্রধান দুটো ঘাট সিমেন্ট বাঁধানো পাকা। একটি পুরুষদের, অন্যটি মেয়েদের জন্য। পুরুষ ঘাটের থাক-থাক সিঁড়ির উপর মস্ত চাতাল। সেখানে বাহারি গেট। গেটের চুড়োয় শ্বেত পাথরের ফলকে কালো অক্ষরে লেখা 'নূতন পুষ্করিণী, প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র, ১৯০২ সাল'।

চন্দ্রবাবুদের ছিল একসময় বিরাট জমিদারি। এখন জমিদারি আর নেই কিন্তু চাষবাস ও

ব্যবসার কল্যাণে তাঁরা যথেষ্ট ধনী। হেমচন্দ্রের তৃতীয় পুরুষ এখন বংশের প্রধান। তিনি শিক্ষিত, সহৃদয় মানুষ। নূতন পুষ্করিণীকে লোকে সহজ করে বলে নতুন পুকুর। পুকুরের প্রধান দু'টি ঘাট বাদ দিলে চারপাশে প্রচুর গাছপালা, বুনো লতাপাতার ঝোপ।

নতুন পুকুরে প্রতিদিন সাঁতার দেয় মণিরাম। সাঁতার সে ভাল জানে। তেমন কেউ শেখায়নি। দেখে-শুনে জলে নেমে সে নিজে-নিজে শিখে নিয়েছে। প্রথম-প্রথম সে নতুন পুকুরের মাঝ বরাবর গিয়ে ফিরে আসত। পরে সাহস বেড়ে গেল। এপারের ঘাটে নেমে সাঁতার দিয়ে পৌঁছে যেত ও পারের কেয়াকুঞ্জে। ওখানে ফণীমনসার কাঁটা গাছের মাঝে-মাঝে কেয়া ফুলের ঝাড়। গুচ্ছ-গুচ্ছ কেয়া ফুলে দারুণ ঝিম ধরানো গন্ধ। লোকে বলে, গন্ধের টানে ওখানে সাপ আসে। মস্ত পুকুর এপার ওপার করা দেখে চন্দ্রবাবুদের এস্টেটের ম্যানেজার রাখাল সরকার অবাক। তাঁর মনে হল ওই ছোট ছেলের এভাবে এতখানি সাঁতার কাটা ঠিক নয়। গভীর জলের বিশাল পুকুরে কোনও কারণে তলিয়ে গেলে থই পাবে না। তাই একদিন পুকুর ঘাটে ওকে ডেকে নিয়ে সরকারবাবু সাবধান করলেন, "ওরে মণিরাম, পুকুরের মাঝ বরাবর যাবি না। ওই হাতিডোবা জলে একটা বড় কাছিম আছে। কাছিমটা সাঁতারু মানুষের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরে জলের নীচে টেনে নিয়ে যায়। কী ভয়ঙ্কর! ওখানে যাসনে। কম জলে সাঁতার কাটবি।"

হাতিডোবা জল অর্থে গভীর জল। তবে সরকারমশাইয়ের কাছিমের গল্পটা সত্যি নয়। মণিরামকে ভয় দেখানোর জন্য বলেছিলেন। ছেলেটা যেন ওভাবে এত বড় পুকুর এপার ওপার না করে। মণিরামের মন সরল। সে কাছিমের কথা বিশ্বাস করেছিল। ভয় পায়নি। তবে এটাও ঠিক করে রেখেছিল ঘাটে যখন কেউ থাকবে না, তখন সে চুপচাপ সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছে যাবে। তবে এখন রাখালদাদুর কথা মেনে নিল।

রাখাল সরকারকে মণিরামদাদু বলে ডাকে। সে ওর রাখালদাদুর কাছে জানতে চেয়েছিল, "মাঝ পুকুরে যেতে যখন বারণ করছ, তখন কোথায় সাঁতার কাটব?"

রাখাল সরকার বুঝিয়ে ছিলেন, "পুকুরের ধার ঘেঁষে কম জলে যত ইচ্ছে সাঁতার দাও, ওতে কোনও ভয় নেই। পুকুরের চারপাশ ঝোপজঙ্গলে ভরা। কিন্তু পুকুরের জলটা খুব পরিষ্কার টলটলে। জলে অনেক বড়-বড় মাছ। জেলেরা এখানে মাছ চাষ করে।"

রাখাল সরকারের কথামতো মণিরাম প্রথমদিন পুকুরের ধার ঘেঁষে কম জলে এক চক্কর দিল। মনে ফূর্তি এল, সে তো অনেকখানি সাঁতার দিতে পারছে! পরের দিন সে ওভাবেই সাঁতার কাটছিল। পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ পাড়ে, গাছপালার মধ্যে লতাপাতা দিয়ে তিন দিক ঘেরা একটা ঝোপের মতো রয়েছে। ঝোপের সামনের দিকটা খোলা। সেখানে দেখতে পেল মাটি রঙের একটি মস্ত শেয়াল ঘোরাফেরা করছে।

ওভাবে শেয়াল দেখে খুব আশ্চর্য হল, কিন্তু সাঁতার দেওয়া থামাল না। পুরো চক্কর কাটল পুকুরের চারপাশে। তারপর জল ছেড়ে উঠল। ঘরে গিয়ে মাকে শোনাল পুকুর পাড়ে শেয়াল দেখার কথা। মা শুনে বললেন, "ওটা নিশ্চয়ই মেছো শেয়াল। পুকুরের জলের ধারে ঘোরাঘুরি করে আর মাছ ধরে খায়। মাছই ওদের খাদ্য।"

মণিরাম সাঁতার কেটে পরদিনও ওখানে গেল, তবে শেয়ালের দেখা পেল না। কিন্তু মনে-মনে ভাবল, ওই তিন পাশ ঘেরা বুনো ঝোপের জায়গাটাই কি শেয়ালের ঘর?

পরের দিন নতুন পুকুরের জলে নামার আগে ওর ইচ্ছে হল শেয়ালের ঘর দেখে আসবে। সেইমতো পুকুরের পাড় ধরে পায়ে হেঁটে এগোতে থাকল। কিন্তু ওদিকে যাওয়ার জন্য পায়ে চলা কোনও পথ নেই। ওখানকার উঁচু-নিচু জমিতে পাথরকুচি আর ফণীমনসার ঝোপে বিছুটি পাতাও আছে। এ ছাড়া লম্বা এক ধরনের ঘাস। লোকজন এদিকে একেবারেই যায় না।

মণিরাম ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোথাও লাফিয়ে, কোথাও মাথা নামিয়ে বিছুটি পাতা বাঁচিয়ে অনেক কসরত করে পৌঁছল যেখানে সে শেয়াল দেখেছিল। ওখানে অবশ্য চারপাশে তাকিয়ে কোথাও শেয়াল দেখতে পেল না। তবে চাপা একটা আঁশটে গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। তখন মাটির দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে প্রচুর আঁশ পড়ে আছে। সামান্য ভেবে নিয়ে মণিরাম বুঝতে পারল মেছো শেয়াল মাছ ধরে এখানে নিয়ে আসে। তারপর আরাম করে মাছ খায়। তবে মাছের শক্ত আঁশ খায় না। তাই এখানে এত আঁশ পড়ে আছে। কিন্তু ভাল করে নজর করে মণিরাম অবাক হল। ঘাস মাটির উপর ছড়ানো ছেটানো আঁশের মধ্যে পড়ে আছে এমন একটা জিনিস, যা দেখে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠল। এটা এখানে এল কী করে?

॥ ২ ॥

শীত শেষ হয়ে বসন্ত ঋতু এসে গিয়েছে। আম গাছে থরে-থরে হলুদ, সবুজ আভা আম মুকুলের শোভা। রোদের তাপ বেড়েছে। চাদর, শাল, সোয়েটার উধাও। দুপুরের দিকে হালকা গরমের আরাম। চন্দ্রবাবুদের জমিদারি না থাকলেও বিশাল দোতলা পাকা দালানে ঠাকুরবাড়ি, নাটমন্দির এসব বর্তমান। আর্থিক কৌলিন্যে জমিদারির ঠাঁটবাট এখনও অনেকখানি বজায় আছে। তাই আধা শহর, আধা গ্রাম ময়নাপুরের মানুষ এখনও প্রতাপচন্দ্রকে বলে রাজাবাবু।

প্রতাপচন্দ্র কী কারণে যেন এসেছিলেন নতুন পুকুরের পাড়ে। চোখে পড়ল টলটলে কাকচক্ষু জল। সে জলের আয়নায় চারপাশের সবুজ গাছপালার ঝাপসা প্রতিবিম্ব। এসব দেখতে-দেখতে

প্রতাপচন্দ্রের চোখ জুড়িয়ে এল। তিনি কর্মব্যস্ত মানুষ। কিন্তু হঠাৎ এখানে এসে কেন জানি না এক পুরনো স্মৃতি উথলে উঠল। মনে হল আহা! কতদিন নতুন পুকুরের জলে নেমে স্নান করা হয়নি। তরুণ বয়সে এখানে কত সাঁতার কেটেছেন। জলে

নামলে তখন উঠতে ইচ্ছে করত না। তারপর কত বছর পার হয়ে গিয়েছে, এরকম ভরা পুকুরে তাঁর স্নান করা হয়ে ওঠেনি।

এর পরই মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল চিন্তা। আজ এখানে স্নান করলে কেমন হয়? দেরি করলেন না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে জানিয়ে দিলেন মনের বাসনা, আজ তিনি নতুন পুকুরে স্নান করবেন। স্ত্রী কমলা অবাক হয়ে বললেন, "ওই ঠান্ডা জলে স্নান করবে হঠাৎ এতদিন পর? না-না, ও কাজ কোরো না।"

প্রতাপচন্দ্র যদিও ষাটের কোঠায়, কিন্তু স্বাস্থ্য বেশ ভাল। এই বয়সে শরীরে অসুখবিসুখ কিছু নেই। কমলা এটুকু বোঝেন, কর্তার মাথায় যখন একবার শখ চেপেছে তখন তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। কয়েক দফা বুঝিয়ে সুঝিয়ে যখন কাজ হল না, তখন বললেন, "ঠিক আছে, জলে নামো তবে এসো তার আগে তোমাকে ভাল করে তেল মাখিয়ে দিই।"

প্রতাপচন্দ্র খালি গায়ে মোড়ার উপরে বসলেন। কমলা উদ্যোগী হয়ে তেলের শিশি নিয়ে প্রতাপচন্দ্রকে তেল মাখাতে শুরু করলেন। অবশ্য প্রতাপচন্দ্রর উৎসাহও কম নয়। হাতের তালুতে তেল নিয়ে ঘষে-ঘষে ভালভাবে তেল মাখলেন সারা শরীরে। রীতিমতো তেল চকচকে হয়ে প্রতাপচন্দ্র চললেন নতুন পুকুরে স্নান করতে। সঙ্গে বাড়ির কাজের লোক বনমালী শুকনো জামাকাপড়, গামছা, চাদর ইত্যাদি নিয়ে বাবুর সঙ্গী হল।

নতুন পুকুরে জলে নেমে দারুণ খুশি প্রতাপচন্দ্র। ইচ্ছে হয়েছিল একবার সাঁতার কাটবেন। তবে শেষ পর্যন্ত সাঁতার না কাটলেও জলে নেমে মনের সুখে বারবার ডুব দিয়ে চারপাশে জল ছিটিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে নিলেন। তারপর ঘাটে উঠে তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা, হাত, পা মুছে শুকনো জামাকাপড় পরে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। অনেকদিন পর এভাবে জলে নেমে স্নান করে মন বেশ চাঙ্গা। সেই খুশি-খুশি ভাব নিয়ে বাড়িতে পা দিয়েই শুরু করলেন বৃত্তান্ত। কীভাবে স্নান করেছেন, কত ডুব দিয়েছেন তবু শরীরে কোনও ঠান্ডা লাগেনি। বরং এখন বেশ তাজা লাগছে। তার সঙ্গে খিদেও পাচ্ছে।

খিদের কথা শুনে কমলা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হেসে বললেন, "একটু বোসো, আমি এখনই তোমার ডান হাতের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" কথা বলতে-বলতে তাঁর চোখ পড়ল স্বামীর ডান হাতের দিকে। দারুণ চমকে উঠে বললেন, "তোমার ডান হাতের অনামিকায় হিরের আংটি ছিল। তেল মাখানোর সময়ও দেখেছি। আংটি কোথায়?"

প্রতাপচন্দ্র আকাশ থেকে পড়লেন। সত্যি, তাঁর আংটি কোথায় গেল? ওটা তো আঙুলে ছিল। তিন পুরুষের হিরের আংটি। ঠাকুরদা পরেছেন, তারপর বাবা, এখন তিনি আঙুলে ধারণ করেন। দামের দিক থেকে আশি হাজারেরও বেশি। তবে তার চেয়ে বড় কথা ওটা অমূল্য স্মৃতি। একই সঙ্গে অত্যন্ত শুভ। ওই হিরের আংটির

প্রতাপচন্দ্র আকাশ থেকে পড়লেন। সত্যি, তাঁর আংটি কোথায় গেল? ওটা তো আঙুলে ছিল। তিন পুরুষের হিরের আংটি। ঠাকুরদা পরেছেন, তারপর বাবা, এখন তিনি আঙুলে ধারণ করেন।

কল্যাণেই চন্দ্র বংশের এত মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ বলে সকলের বিশ্বাস।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী হিরের আংটি হারিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন রাজাবাবু প্রতাপচন্দ্র। একটু ধাতস্থ হয়ে তিনি অনুমান করলেন এক সম্ভাবনা। স্নান করার আগে তিনি প্রচুর তেল মেখেছিলেন। হাত, পা তেলে পিছল হয়ে ছিল। তারপর জলে নেমে তিনি যখন মহা উৎসাহে হাত, পা ছুড়ে জল ছিটিয়ে ডুব দিয়ে স্নান করছেন, তখন পিছল আঙুল থেকে আংটিটা নিশ্চয়ই জলে পড়ে গিয়েছে।

তিনি স্থিরবুদ্ধি মানুষ। তাই ঠিক করলেন আংটি খুঁজতে হবে পুকুর ঘাটে, যেখানে তিনি স্নান করতে নেমেছিলেন। দেরি করলেন না। বিশ্বস্ত কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুকুর ঘাটে পৌঁছে গেলেন। সকলে মিলে আংটি খোঁজা শুরু হল।

জেলেদেরও ডেকে আনা হয়েছিল। চুনোপুঁটি বা মাছের চারা তোলার জন্য সরু জাল নিয়ে তারা নেমে পড়েছিল জলে। বেশ কয়েকবার জাল ফেলা হল। নুড়ি পাথর বা ওই ধরনের কিছু উঠে এল কিন্তু আংটির হদিশ পাওয়া গেল না। চন্দ্রবাড়ির সকলের দারুণ মন খারাপ। প্রতাপচন্দ্র দুঃখে খাওয়াদাওয়া ভুলে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি ঘোষণা করলেন হিরের আংটটা যদি কেউ খুঁজে এনে দিতে পারে, তবে তিনি এক লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দেবেন। তার সঙ্গে যথেষ্ট মূল্যবান উপহার। মফসস্‌লে এক লক্ষ টাকা এখনও অনেক দাম।

॥ ৩ ॥

মণিরাম পুকুর ঘাট থেকে এসে মাকে মুঠো খুলে দেখাল, "দ্যাখো মা কী পেয়েছি!"

মণিরামের মা দারুণ অবাক, "কোথা থেকে, কীভাবে পেয়েছিস?"

সংসারে ওরা দু'জন, মা ও ছেলে। মণিরামের বাবা কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। ওরা খুব গরিব। খড় ছাওয়া মাটির ঘরে থাকে। মা এখন লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালান। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে মণিরাম। সে এবার ক্লাস নাইনে উঠেছে। ক্লাসে ফার্স্ট, সেকেন্ড হতে না পারলেও মণিরাম লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল। অভাব অনটনের সংসার, মাথার উপরে নানা ধরনের সমস্যার চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মণিরাম প্রতিদিন সাঁতার কাটে। সাঁতারে শরীর চাঙ্গা হয়। মনের জোর বাড়ে। প্রতিদিনের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সে রসদ জোগাড় করে ওইভাবে।

তবু সংকটের শেষ নেই। এবছর বসন্ত কালে পরপর দু'দিন প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। ওদের পাশাপাশি দুটো ছোট মাটির ঘর রয়েছে, উপরে খড়ের ছাউনি। একটা ঘরে মণিরাম মায়ের সঙ্গে শোয়। পাশের ঘরে সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র। এক পাশে ছোট চৌকিতে রাখা থাকে ওর বইপত্তর। সেখানে বসেই লেখাপড়া করে। কিন্তু এবার দু'দিনের বৃষ্টির দাপটে ওই ঘরের একদিককার মাটির দেওয়াল ধসে বই, খাতা সব থসথসে ভিজে মাটির দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে যায়। জলে

ভিজে বই, খাতা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বই নেই স্কুলে যাবে কী করে? সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। অবশ্য মাস্টারমশাইরা ওকে বই জোগাড় করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সেটুকুই ভরসা। এদিকে ঘরের ভেঙে পড়া দেওয়াল মেরামত করতে হবে। কিন্তু সে সামর্থ্য কোথায়? হাতে কোনও টাকা নেই। এরকম দুর্দশার সময় সেদিন মণিরাম ঘাট থেকে এসে যখন ওর হাতের মুঠি খুলে মাকে দেখিয়েছিল, তখন ওর মায়ের চোখে বিস্ময়। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে, কীভাবে পেয়েছিস?"

এর পর নতুন পুকুরের পাড়ে শেয়াল ঝোপের ভিতর মাটিতে পড়ে থাকা আঁশের মধ্যে কীভাবে সে দেখেছিল জিনিসটি সে বৃত্তান্ত খুলে বলল। মণিরামের মা খুব সৎ, ভালমানুষ। তাঁর মনে কোনও লোভ নেই। সব শুনে বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, "এটার মালিক কে আমরা জানি না। কোথায় কীভাবে তাঁকে খুঁজে পাব? এটা দামি জিনিস। খোঁজাখুঁজির সময় লোকের চোখে পড়ে যাওয়া সম্ভব। তখন বিপদ হতে পারে। চল, বরং এটা নিয়ে এটা নিয়ে গিয়ে থানায় জমা করে আসি।"

মণিরামের ভাবনা হল। সে বলল, "ভাল কথা। কিন্তু পুলিশ যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করে? উলটে আমাদের চোর ভাবে?"

মণিরামের মা হেসে সাহস জোগান, "আমরা তো সত্যি-সত্যি চুরি করিনি। কুড়িয়ে পেয়েছি। ভয় নেই, সত্যি কথা বলব যেভাবে পেয়েছি। পুলিশ নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে।"

ওরা থানায় যায়। থানার বড়বাবু সব বৃত্তান্ত শুনে অবাক। ঘটনাক্রমে তিনি খুব ভালমানুষ। তাই বললেন, "এটা খুব দামি জিনিস। তবে তার চেয়েও দামি তোমরা। আজকালকার দিনে এরকম সততা দেখা যায় না। এটা যার জিনিস তাকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেব, তোমরা কোনও চিন্তা কোরো না। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাও।"

॥ ৪ ॥

দারোগাবাবুর কাছ থেকে জিনিসটা হাতে পেয়ে প্রতাপচন্দ্রের মনে দারুণ উল্লাস। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "আপনি আজ অনেক বড় উপকার করলেন। এখন মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। এভাবে ফিরে পাব কখনও ভাবিনি। এই আংটি বড় পয়মন্ত। বিশ্বাস করুন, যার হাতে এ আংটি একবার পড়বে, তার ভাগ্য খুলে যাবে। হিরের এই আংটিটা আমাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী। তাই আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু যারা এত দামি জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে বুদ্ধি বিবেচনা করে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, তাদের আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই।"

"আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন। আমি এখনই ওদের ডেকে পাঠাচ্ছি," দারোগাবাবু জানালেন।

প্রতাপচন্দ্র হাত তুলে বললেন, "না, ওদের কাছে আমি নিজে যাব।"

"চলুন, চলুন আমরাও যাচ্ছি," আশপাশে কয়েকজন বলে উঠল।

"না, কাউকে যেতে হবে না। আমি একা যাব। সকলে মিলে গেলে ওরা বিব্রতবোধ করবে।"

প্রতাপচন্দ্র কাউকে সঙ্গে নিলেন না। শেষপর্যন্ত একা গেলেন। তাঁর মনে অনেক কৌতূহল।

ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুপুরবেলা ভাঙা ঘরের একপাশে মা ও ছেলে তখন খেতে বসেছে। অবাক হয়ে দেখলেন দুটো থালায় সামান্য ভাত, একটু বোধ হয় শাক ভাজা, তার সঙ্গে ঝোল-ঝোল কোনও তরকারি। মাছ, ডিম কিছু নেই। তরকারিও ফ্যাকাশে রঙের। তেল-মশলা খুব কম।

প্রতাপচন্দ্রকে হঠাৎ সামনে দেখে দু'জন সন্ত্রস্ত হয়ে থালা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, যাদের এত অভাব তারা এত ভাল হয় কী করে? হিরের আংটি কুড়িয়ে পেয়েও থানায় ফেরত দিয়ে আসে! একইসঙ্গে তাঁর কৌতূহল, ওখানে আংটিটা গেল কীভাবে? এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু রহস্যের সমাধান হয়নি। তাই প্রবল কৌতূহলে প্রথমেই বললেন, "বাকি সব কথা পরে হবে, আগে বলো ওখানে আংটি গেল কেমন করে? সব খুলে বলো। সে কথা জানার জন্য আমার মন ছটফট করছে। আমি কোনওভাবেই বুঝতে পারছি না, আমার হাতের আঙুলে পরে থাকা আংটি ওখানে কি উড়ে চলে গেল?"

মণিরামের মা মাথা নিচু করে নমস্কার জানিয়ে সহজভাবে বুঝিয়ে বললেন, "না রাজাবাবু, উড়ে যায়নি। মনে হয় স্নান করার সময় আপনার হাত থেকে কোনওভাবে খুলে আংটিটা জলে পড়ে গিয়েছিল। কোনও বড় মাছ জলের নীচে চকচকে আংটি দেখে পোকামাকড় বা ওই ধরনের কিছু ভেবে খেয়ে নেয়। আংটিটা মাছের পেটের মধ্যে ছিল। জেলেদের জালে ধরা পড়ে মাছটা কোনওদিন বাজারে বিক্রি হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, ওই মাছটাকে ধরে ছিল পুকুরের ধারে ঘুরে বেড়ানো মেছো শেয়াল। তারপর পুকুর পাড়ে নিজের জায়গায় গিয়ে মাছটা ছাড়িয়ে খেয়েছিল। তবে মাছের ধারালো শক্ত আঁশ শেয়াল একেবারেই পছন্দ করে না। তাই আঁশের সঙ্গে আংটিটা ওখানে পড়েছিল। এদিকে মণিরাম কৌতূহলে পুকুর পাড়ে গিয়েছিল শেয়ালের ডেরা দেখতে। সেখানেই ছড়ানো আঁশের মধ্যে আশ্চর্য রকমভাবে সে খুঁজে পেয়েছিল আংটিটা।"

॥ ৫ ॥

প্রতাপচন্দ্র তাঁর আংটির জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন নির্লোভ মণিরাম ও তার মাকে দেখে। তিনি সহৃদয়, বিচক্ষণ মানুষ। তাই পরিস্থিতি বুঝে সেখানেই সিদ্ধান্ত নিলেন কী করবেন।

মণিরামকে কাছে ডেকে নিলেন। সস্নেহে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, "আমি জানি তুমি খুব ভাল সাঁতার কাটতে পার। তবে শুধু নতুন পুকুরে নয়, তোমাকে সাঁতার কেটে খাল, বিল, নদী পার হয়ে একদিন সাগরে পৌঁছতে হবে।"

কিছু বুঝতে না পেরে মণিরাম বিস্ময়ে চেয়ে রইল রাজাবাবুর মুখের দিকে।

তিনি ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আমি বোঝাতে চাইছি, এখন তুমি স্কুলে পড়ছ। এর পর একে-একে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে তোমাকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। আমি তোমার পাশে আছি।"

মণিরাম ও তার মা কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে চেয়ে রইল রাজাবাবুর মুখের দিকে। শুধু কথা নয়, প্রকৃত অর্থে প্রতাপচন্দ্র সেই দিন থেকেই ওদের লালন পালনের সমস্ত ভার নিয়ে নিলেন।

সত্যিই কি পয়মন্ত হিরের আংটির ছোঁয়াতেই হল ওদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী লাভ?

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

almagazine.in

ফারাক পাও

দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

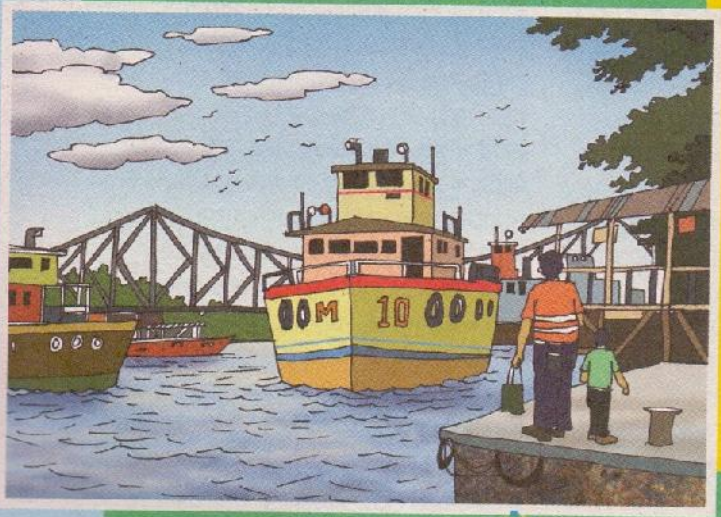

ছবি: প্রীতম দাশ

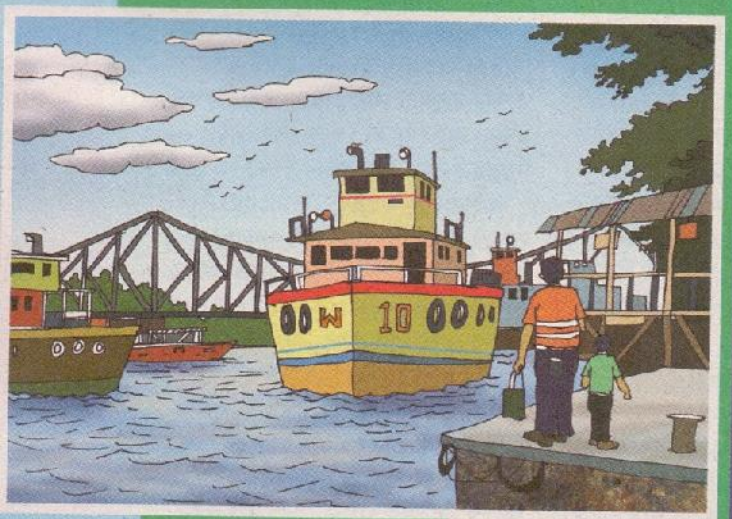

উত্তর : ২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১) গাড়ির চাকার একটা স্পোক নেই।
২) গাড়ির গায়ের ছোট নীল তারাটির স্থান পরিবর্তন হয়েছে।
৩) গাড়ির গায়ে লাল রঙের বেলুনের সুতো নেই।
৪) গাড়ির একটি তারার রং বদলে গিয়েছে।
৫) সিলিন্ডারের রিংয়ের দূরত্ব সমান নয়।
৬) ছেলেটির হাতের ব্যাগটি ছোট।
৭) বাচ্চার গেঞ্জির হাতায় ডিজ়াইন নেই।
৮) সিলিন্ডারের নবটি নেই।

সুদোকু

				৬				
৬		৩				১		৪
		১	৯		৮	৫		
	৯		৪	৫	৬		১	
	৬						৮	
	৫		৮	৭	৩		২	
		৬	১		৫	৯		
৪		৯				৮		৬
				৯				

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৯	৪	৩	৭	৬	১	২	৫	৮
৫	৭	২	৮	৯	৪	১	৬	৩
১	৬	৮	৫	৩	২	৯	৪	৭
৩	২	১	৬	৮	৯	৪	৭	৫
৭	৫	৯	৪	২	৩	৬	৮	১
৪	৮	৬	১	৫	৭	৩	২	৯
৮	৯	৪	২	১	৫	৭	৩	৬
৬	১	৭	৩	৪	৮	৫	৯	২
২	৩	৫	৯	৭	৬	৮	১	৪

সুদোকুর সমাধান করে ফোটো তুলে পাঠিয়ে দাও এই ছমেল আইডিতে, anandamelamagazine@gmail.com। সঙ্গে লিখবে স্কুল আর ক্লাস।

আমার বন্ধু

আমি আর শিপ্পিতা

আমার প্রিয় বন্ধু হল শিপ্পিতা। আমরা দু'জনে একই স্কুলে পড়ি। যদিও আমার চেয়ে ও এক ক্লাস নীচে পড়ে। আমার দু'জন একই স্কুলে আঁকাও শিখি। আমাদের দু'জনেরই আঁকতে খুব ভাল লাগে। আঁকার ব্যাপারে অনেক সময় আমরা পরামর্শ করি, একে অন্যকে আইডিয়া দিই। যেহেতু আমি ওর চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ি, তাই মাঝে-মাঝেই লেখাপড়ার ব্যাপারে ওকে সাহায্য করি। দু'জনে মিলে আর যেটা করি সেটা হল, গোপালপুজো। সেটা শীতকালে হয়। পুরো ব্যাপারটাই তখন বনভোজনের চেহারা নিয়ে নেয়। গোপালপুজোয় আমাদের মেনু থাকে খিচুড়ি, আলুর দম, পাঁচ রকম ভাজা ও পায়েস। আমাদের এই পুজো তথা বনভোজনে বড়রা মত দেন না, তাও আমরা করি। এর পরের বছর থেকে ঠিক করেছি কিছু বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আরও বড় করে পুজোটা করব এবং 'আনন্দমেলা'র সবাইকে নেমন্তন্ন করব।

কুমকুম পাল
অষ্টম শ্রেণি, বাণীপীঠ হাই স্কুল, কলকাতা।

দ্যাখো, ভাবো আর আঁকো

ছবি আঁকতে সবাই ভালবাসে। তাই এই ছবি আঁকার বিভাগ। এখানে আঁকা অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করো দেখি। আঁকা শেষ হলে রং করে ফ্যালো ছবিটাকে।

ছবি: কুনাল বর্মণ

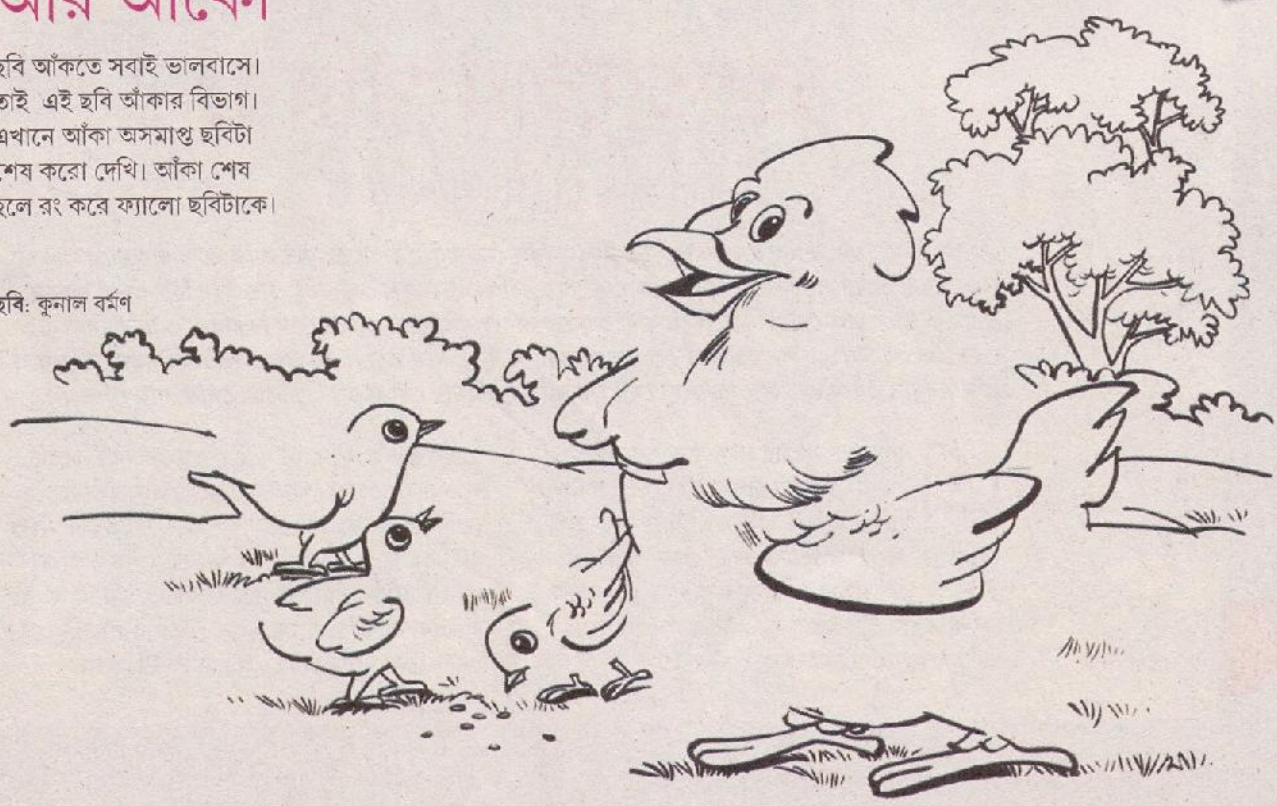

চন্দ্রতালের পরিরা

দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত

(আগে যা ঘটেছে : লাহলুংয়ে যে বাড়িতে নীলরা ছিল সেই বাড়িতে রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে পাওয়া গেল প্ল্যাটিনামের প্রস্থেসিস, যার দাম সোনার চেয়ে বেশি। ইউরোপে তৈরি ওই ডাক্তারির চিকিৎসার জিনিস ওই গ্রামে কীভাবে এল খোঁজ নিয়ে গিয়ে বাবা জানতে পারলেন ওখানে এসেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ফ্রেডরিক পেটিট। এর পর চন্দ্রতাল হ্রদে বেড়াতে গিয়ে নীল খাদে পড়ে যায়। উদ্ধার পাওয়ার সময় সে দেখতে পায় ভবঘুরে ইয়ামামোতোর মৃতদেহ। সেই মৃত ব্যক্তির ডায়েরি থেকে ডাঃ পেটিটের খোঁজ পায় পুলিশ।)

এক সংবাদ সংস্থার সঙ্গে কথা বলার পর বুঝলাম খিদেটা চাগাড় দিয়েছে। লাঞ্চ করা দরকার। গেস্ট হাউজে পৌঁছনোর আগেই বহরমপুর থেকে পরপর কয়েকটা ফোন চলে এল। টিভি এবং রেডিয়োর খবর নাকি বলেছে যে বাঙালি কিশোরের সাহসিকতার সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শল্যচিকিৎসককে উদ্ধার।

কিন্তু সত্যিই কি আমি কিছু কাজের কাজ করেছি? আচমকা পড়ে না গেলে ইয়ামামোতোর মৃতদেহ আবিষ্কার করতে পারতাম কি? এটা তো একটা নিছক দুর্ঘটনা। তা হলে এর কৃতিত্ব আমার, নাকি অলক্ষ্যে যিনি ঘটাচ্ছেন তাঁর? কে তিনি, ঈশ্বর? উনি কি সত্যিই আছেন, নাকি আমাদের কল্পনা? একের পর-এক যে ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে, আমার কি উচিত নয়

সেগুলোকে অনুসন্ধান করা? বিজ্ঞান তো সত্যের অন্বেষণ। আচ্ছা, ইয়ামামোতো কি পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা বলেছেন?

সন্ধেবেলা টিভি খুলেও কিছু খবর পেলাম না। এসব নির্জন প্রান্তিক জায়গায় বেশি চ্যানেল ধরে না। ভাগ্যিস পি টি আই জানিয়েছিল নয়তো প্রোফেসর ফ্রেডরিকের এত ভাল খবরটা পেতাম না। শুভমামা থেকে-থেকে বলে উঠছে, ''জয় সত্যের জয়। থ্রি চিয়ার্স ফর বেঙ্গল, হিপ হিপ হুররে।''

ইয়ামামোতোর ভিশুয়াল হ্যালুসিনেশন হয়েছিল কিনা জানি না। বা ওই লরিওয়ালাগুলোর। আমার কিন্তু পাঁচটা ইন্দ্রিয় সজাগ আছে এবং সুস্থ। ঘুমোতে যাওয়ার আগে বারবার নিজেকে বললাম, 'হাল ছাড়িস না নীল, এগিয়ে যা।' ভদ্রসা থেকে যে জিজ্ঞাসার শুরু তার শেষ দেখতেই হবে আমায়। বালিশটা টেনে নিলাম। প্রিয় বন্ধু মৈনাককে মিস করছি। সারারাত জেগে ওর সঙ্গে বকরবকর করলে আমার মনটা শান্ত হত। না, আগামিকাল ওকে একটা ফোন করতেই হবে।

॥ ২০ ॥

আমরা বসে হিমাচলের কাংড়ায়। একটা ঝাঁ চকচকে কর্পোরেট হাসপাতালে। কিন্তু এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়? ফ্রেডরিক পেটিটকে এমারজেন্সি চিকিৎসার জন্য আপাতত এখানেই রেখেছে হিমাচল পুলিশ। উনি একটু ভাল হলে নয়াদিল্লির বড় কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। শুভমামা আর অ্যানাদি হোটেলে আছে। বাবা আর আমি চলে এসেছি।

ঘরে ঢুকেই চমকে গেলাম। কঙ্কালসার জীর্ণ চেহারার একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ। ইনিই বাবার হিরো, ডাঃ পেটিট?

বাবা আমাদের দু'জনের পরিচয় দিল ওঁর কাছে।

ওঁর চোখদুটো ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উঠে বসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাবা আর ম্যানেজারের আপত্তিতে আবার শুয়ে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ আমাকে নিরীক্ষণ করলেন উনি। তারপর আস্তে করে বললেন, ''কনগ্র্যাচুলেশন্স।''

আমি প্রত্যুত্তরে ''থ্যাংক ইউ, মাই প্লেজার'' বলেই বুঝলাম ইংরেজিতে এর চেয়ে ভাল শব্দ আমার অন্তত জানা নেই যাতে আমার এই কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসার মিশ্র অনুভূতিটা প্রকাশ করা যায়। উনি নিজেই বললেন, ''আমার কাহিনি পুরোটা না জানলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তুমি রেকর্ডার এনেছ কি?''

"এই দুর্বল শরীরে এখন এত কথা বলা আপনার উচিত হবে না স্যার," বাবা বলে ফেলল।

"না বললে আমি শান্তি পাচ্ছি না যে। তুমি জান কতদিন বাদে আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলছি? আমাকে বলতে দাও।''

আমি ক্যামেরায় ভিডিয়ো রেকর্ডিং বাটন অন করলাম। তারপর অতিথিদের জন্য রাখা সোফায় গিয়ে বসে পড়লাম। প্রোফেসর ফ্রেডরিক পেটিট মৃদুস্বরে বলতে শুরু করলেন। "ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে জগিং করা আমার চল্লিশ বছরের অভ্যেস। তারপর স্নান করে, ব্রেকফাস্ট সেরে হাসপাতালের দিকে রওনা হই। রবিবারেও এক রুটিন। তফাত হল রবিবারে হাসপাতালে যাওয়ার আগে 'ক্লিনিক দ্য ফ্রান্সিলিয়ন'-এ আমি দুঃস্থ রোগীদের দেখি। সেদিনটা ছিল রবিবার। ক্লিনিকের সামনে গাড়িটা পার্ক করে রোগী দেখলাম। বেরিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু গাড়িটার ইঞ্জিন কিছুতেই চালু হল না। গিয়ার বক্স, ইঞ্জিন চেক করলাম। না, কোথায় গন্ডগোল বুঝতে পারছি না। মাথা নিচু করে গাড়ির বনেট খুলে ইঞ্জিনটা খুঁটিয়ে দেখছিলাম, এমন সময় মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

"'হ্যালো!' আমি কিঞ্চিৎ বিরক্তি সুরে বললাম।

"'ডাঃ পেটিট?'

"'হ্যাঁ, কে?'

"'বেকার সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনার গাড়ি স্টার্ট দেবে না।'

"'আপনি জানলেন কীভাবে?' কথাটা বলেই বিদ্যুৎবেগে আমি বাঁ দিকে ঘুরলাম। আর তখনই দেখতে পেলাম, অদূরে একটা রেস্তরাঁর সামনে দু'জন লোকের আবছা চেহারা। ওরা ভাবতে পারেনি যে চট করে আমি বাঁ দিকে ঘুরে ওদের বুঝে যাব। আসলে বেশির ভাগ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল ডান দিকে যাওয়া। ওই লোক দুটোই যে ফোন করছে তা বুঝলাম কারণ, ওরা দৌড়চ্ছিল আর সঙ্গে-সঙ্গে মোবাইলে ওদের গলাটা কাঁপা-কাঁপা আসছিল। আমার গাড়ি খারাপ করার মাথামুন্ডু বুঝতে না পারলেও একটা অশনি সংকেত আমার মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল।

বিদ্যুৎবেগে আমি বাঁ দিকে ঘুরলাম। আর তখনই দেখতে পেলাম, অদূরে একটা রেস্তরাঁর সামনে দু'জন লোকের আবছা চেহারা। ওরা ভাবতে পারেনি যে চট করে আমি বাঁ দিকে ঘুরে ওদের বুঝে যাব।

"যা ভেবেছি ঠিক তাই। চেনা নম্বর থেকে ফোনটা এল। আমার মেয়ে ফ্লোরেট। আমার একমাত্র সন্তান।

"'বাবি! বাবি তুমি কোথায়? তুমি ঠিক আছ?'

"একটা অস্পষ্ট ফোঁপানির আওয়াজ পেলাম। তার সঙ্গে কয়েকজনের চেঁচামেচি।

"'ফ্লোরেট, কী হয়েছে?' অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা গুড়গুড় করে উঠল।

"'আমাকে আর মাকে বন্দি করে রেখেছে এরা বাবি। ঘর থেকে কোথাও বেরতে দিচ্ছে না।'

"এতটা খারাপ কিছু হতে পারে তা কিন্তু আন্দাজ করতে পারিনি। আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কে যেন দু'হাতে আমার টুঁটি চেপে ধরেছে।

"ওরা কারা? কী চায়?' কোনও রকমে বললাম আমি।

"জানি না। মা পুলিশের নম্বরে ডায়াল করেছিল বলে মায়ের ডান হাতে এমন মেরেছে যে হাতটা..." ফ্লোরেট কান্নায় ভেঙে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গে নম্বরটা কেটে গেল। হাজার চেষ্টা করেও পেলাম না। রিং হয়ে চলেছে কিন্তু কেউ তুলছে না।

ফ্লোরেট, আমার ছোট্ট ফুল। একুশ বছরের তাজা প্রাণবন্ত মেয়ে। ইউনিভার্সিটির স্কলার। সাহিত্যের প্রতি ওর দারুণ আকর্ষণ। কবিতা লিখে একটু-আধটু নামও করেছে। কারও ক্ষতি তো চায়ই না, উলটে পরোপকার করতে ভালবাসে। সেই মেয়েকে কারা মারধর করছে? আমার স্ত্রী লিলিয়ান? সে তো তার সংসার আর ফুলের বাগান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওরা কী দোষ করল?

বাজের আলোর ঝলকানির মতো আমার মাথায় খেলে গেল উত্তরটা। আমিই হলাম সেই কালপ্রিট, যার জন্য আমার স্ত্রী আর মেয়ের এই ভোগান্তি। কিন্তু কী চায় এরা? আমার চেয়ে তাবড়-তাবড় ধনী লোক আছেন প্যারিসে। তা হলে আমার পরিবারকে টার্গেট করা কেন? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম গাড়ির পাশে। খোলা বনেটটা বন্ধ করার কথাও মাথায় এল না। এখন যদি পাবলিক বুথ থেকে পুলিশকে ফোন করি তা হলে আমার পরিবারের পক্ষে সেটা আদৌ ভাল হবে না খারাপ, এই চিন্তা আমার ভিতরে ঘুরপাক খেতে লাগল।

"আমার ডায়গনোসিস অব্যর্থ। আমার জন্যই ফ্লোরেট আর লিলিয়ানের হয়রানি। পাবলিক বুথের জন্য দু' পা এগিয়েছি আমার সামনে একটা নীল গাড়ি এসে থামল। গেট খুলে বেরিয়ে এল একজন।

"'প্রোফেসর, নিজের পরিবারকে বাঁচাতে চাইলে তাড়াতাড়ি এটাতে উঠুন।'

"মুহূর্তের মধ্যে বুঝলাম এরা ভীষণ সংঘবদ্ধ। সমস্তটা সুপরিকল্পিত এবং ছকা হয়েছে আমাকে অপহরণের জন্য। যাব কী যাব না দোনোমনো করে লাভ নেই। এদের কাছে নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র আছে। যদিও হুকুমটা আপাতভাবে নিরীহ সুরে করছে।

"আমি বিনা বাক্যব্যয়ে ওদের গাড়িতে উঠে পড়লাম।

"প্যারিস শহরের রাস্তাগুলো মোটামুটি সবই আমার চেনা। গাড়ি যখন পোর্তে দে লা চ্যাপেল দিয়ে এ ওয়ান রুট ধরল নিশ্চিত হলাম যে এয়ারপোর্টের দিকে চলেছি। ফ্রান্সের বাইরে কোনও কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য প্রায়শই আমায় চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে আসতে হয়। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এখন কী উদ্দেশ্যে এবং কেন? আমার দু'পাশে দু'জন লোক গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে আছে। যদিও রিল্যাক্সড মুডে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আদপেই তা নয়। গাড়িতে ওঠার পরপরই একজন ক্রমাগত তার মোবাইলে আমার বেশকতক ফোটো তুলে নিল। আর-একজন একটি সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের ক্যান ধরিয়ে দিল আমায়।

"'খেয়ে নিন।'

"আমি ঘাড় নাড়াতে বলল, 'তা হলে ফ্রুট জুস দিই? অ্যাপল না লেমন?'

"আর লেমন! মুখের ভিতরটা টক স্বাদে ভরে গিয়েছে। ঢেকুর উঠছে। স্ট্রেস হলে অম্বল হয়ে যায় আমার।

"'আপনার পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন নাকি? এই নিন।'

"আমার সামনে একটা আইফোন ধরাল। হঠাৎ দেখলাম

আমার বাড়ির ড্রয়িং রুমের সোফা। লিলিয়ান আধশোয়া অবস্থায়। ডান হাতটায় ব্যান্ডেজ নাকি প্লাস্টার? ওহ মাই গড! ওর হাত ভেঙে দিয়েছে! আমি উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলাম। ডান দিকে বসা কুতকুতে চোখের লোকটা আমার মুখটা চেপে ধরল ওর রুমালে। তারপর চিবিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, 'পেটিট, খবরদার টুঁ শব্দটি কোরো না। তোমার মেয়ে আর বউ কিন্তু আমাদের হেফাজতে আছে। যা বলছি চুপচাপ তাই করো। শিগগিরি ছাড়া পেয়ে যাবে।'

"অবাক চোখে ফ্যালফ্যাল করে দেখলাম ও ওর ফাইল থেকে আমার পাসপোর্টটা বের করল। আশ্চর্য, এটাই তো হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে গত মাসে নতুন একটা পাসপোর্টের জন্য আবার আবেদন করেছিলাম সরকারের কাছে। তা হলে ওটা হারায়নি, এরা চুরি করেছিল! উফ ঈশ্বর, কী সাংঘাতিক বদমাশ এরা। না ফ্লোরেট আর লিলিয়ানের জন্য আপাতত মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে। এতকাল শুধু ভাল চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করে এসেছি, কিন্তু এখন আমায় পরীক্ষা দিতে হবে আমি কত ধৈর্যশীল পিতা আর দায়িত্বশীল স্বামী। নিশ্চয়ই পাশ করতে পারব মনে-মনে ভাবতে থাকলাম। গেট পেরিয়ে গাড়িটা যখন এয়ারপোর্টের ডোমেস্টিক বিল্ডিং ছাড়িয়ে ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিংয়ের দিকে চলেছে আমার কেমন কান্না পেয়ে গেল। ফ্রান্স ছেড়ে, লিলিয়ান আর আদরের ফ্লোরেটকে ছেড়ে কোন মগের মুলুকে চললাম?

"এয়ার ফ্রান্সের একটা বোয়িং জেট বিমানে বসে-বসে আমার পিঠ ব্যথা হয়ে গেল। নিজের অবস্থা যে কাউকে খুলে বলব তা দূরস্থান, এমনকী এ বিমানটা যাচ্ছে কোথায় তাও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। শোনামাত্র অন্যান্য যাত্রী বা বিমানের ক্রুদের মধ্যে যদি কোনও রকম সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে মুশকিল। পুলিশ পর্যন্ত খবর পৌঁছে যাবে। তা হলে এ জন্মের মতো আমার স্ত্রী কন্যাকে হারালাম। এ গুন্ডারা ওদের চিরতরে খতম করে দেবে।

"প্রচুর ব্রিটিশ সহযাত্রী এই বিমানটিতে। আন্দাজ করলাম হয়তো ইংল্যান্ড যাচ্ছে ফ্লাইট। অব্যর্থ আন্দাজ আমার। ফেলিক্সটাও বিমানবন্দরে এসে নামলাম। গাড়িতে থাকতেই আমার মোবাইল, ওয়ালেট সব কেড়ে নিয়েছে ওরা। হতবুদ্ধি জড়পদার্থের মতো ওদের পিছন-পিছন ঘুরতে লাগলাম। বিমানবন্দরের গেটের কিছু বাইরে একটা লালচুলো লোক দাঁড়িয়েছিল। সাদা রঙের দারুণ সুন্দর একটা গাড়ির গেট খুলে দাঁড়িয়ে আমাকে ভিতরে আহ্বান করল। একজন বিমানবন্দরের কর্মী এগিয়ে আসছিল দেখে আমি উৎসুক চোখে তাকালাম। কিন্তু লালচুলোটা "টুরিস্ট" বলাতেই কর্মীটা সরে গেল। যে অন্ধকার সে অন্ধকারেই রইলাম। গাড়ি স্টার্ট দিল। আমার খুব খিদে পেয়েছে। সেই ব্রেকফাস্টের পর সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। লিলিয়ান কি খাচ্ছে? মেয়েটার পেটেও কি দানাপানি পড়েছে? এত সব ভাবতে-ভাবতে দেখি গাড়ি ফেলিক্সটাও শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। শহরটার চেহারাটা কেমন গ্রাম-গ্রাম। হালফিলের কংক্রিট জঙ্গল নয়। গাড়িটা এসে থামল একটা রেস্তরাঁর সামনে। লালচুলোটা কি বুঝতে পেরেছে যে আমি ক্ষুধার্ত?

"আমার সঙ্গের বদমাশগুলো পিছনে আর-একটা গাড়িতে করে আসছিল তা খেয়াল করিনি। রেস্তরাঁর ভিতরে ঢুকে অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় বসলাম। মেনু কার্ড আমার সামনে। আমি ফ্রান্সের একজন নামজাদা চিকিৎসক। অথচ ফুটো পকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের এক রেস্তরাঁয় বসে আছি। ভাগ্যের কী পরিহাস! কিছু যে অর্ডার করব সে সাহসও হচ্ছে না। লালচুলোটা আমার জন্য চিকেন স্যান্ডউইচ আনিয়ে দিল। আর ব্ল্যাক কফি। আমার পছন্দের খাবারদাবার সম্বন্ধেও পাক্কা হোমওয়ার্ক করে রেখেছে। কী সব্বোনেশে পাকা মাথা এদের।

"রেস্তরাঁয় বসে-বসে কাঠের দেওয়ালে লাগানো ছবিগুলো দেখছিলাম। ফেলিক্সটাও শহরটার ইতিহাস বেশ পুরনো। আমি ওল্ড ফেলিক্সটাওয়ে বসে আছি। এটা একটা হ্যামলেট বই আর কিছু নয়। এ জন্যই গ্রাম্য ধাঁচ। পাশেই গির্জা। আজ রবিবার তাই সারাদিন ধরেই প্রার্থনার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। এখানে আমাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছুটল একটা স্পোর্টস সেন্টারের পাশ দিয়ে। ব্র্যাকেনবেরি স্পোর্টস সেন্টার। সবুজ মাঠের সঙ্গে লাল সুরকির টেনিস কোর্টও আছে। আরে আরে ওটা কী? গাছপালার ফাঁক দিয়ে নীলচে মতো? ওটা আকাশ হতেই পারে না। আমাকে অবাক করে দিয়ে গাড়ি এসে পড়ল এক বিরাট সমুদ্রের পারে। নর্থ সি।

"হাঁ হয়ে গেলাম। জেটি, পোড়া কপাল আমার। এরা কি তবে বন্দরে নিয়ে এল? ওহো তাই ফ্লাইটে বসে যাত্রীদের আলোচনার মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলাম ফেলিক্সটাও পোর্ট শব্দটা। পিছনের শয়তানগুলোও এসে পড়েছে। ওদের গাড়িটা কালো রঙের খুব দামি গাড়ি। কী ভয়ানক ক্ষমতাবান আর অর্থবান গোষ্ঠীর পাল্লায় পড়েছি। এ যাত্রায় প্রাণে বাঁচলে হয়। কুতকুতে চোখের যে লোকটা আমার মুখে রুমাল চেপে ধরেছিল, সে এবার আমার গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল। বন্দর অঞ্চলের প্রতিটি লোকের চেনা। প্রত্যেকটি সিকিউরিটি গার্ড। কেউ একবারও ওর প্রবেশপত্র দেখতে চাইল না। ইমিগ্রেশন ফর্ম্যালিটি বাদ গেল। মাই গড, লোকটা কি এই বন্দরের হর্তাকর্তা কেউ? সোজা গাড়িকে নিয়ে এল বন্দরের ভিতরে।

"ইয়াসমিন নামে একটা মালবাহী জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে ফেলিক্সটাওর বন্দরে। লালচুলোটা হঠাৎ কোত্থেকে আবির্ভূত হল।

"'কী দেখছেন ডক্টর? চলুন ভেসে পড়ি। আসুন-আসুন প্লিজ।'

"ভেসে পড়ি মানে? বলে কী এরা! এতটা আকাশপথ পেরিয়ে এসেও নিস্তার নেই, এবার জলে ডোবার পালা! ফেলিক্সটাওয়ে সূর্যাস্ত শুরু হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। ইংল্যান্ডের বিকেল ফ্রান্সের মতো অপরূপ নয়। আমার ভাগ্যের আকাশেও সূর্যাস্ত হতে চলেছে। বিমর্ষ মন নিয়ে জাহাজের ডেকের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। অল্প-অল্প হাওয়া দিচ্ছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা আর মনে নেই।"

॥ ২১ ॥

"ঘুম ভাঙল যখন তখন আকাশে তারা ফুটে উঠেছে। আমিও আর ডেকে বসে নেই। সুসজ্জিত একটা কেবিনের মখমলের মতো বিছানায় শুয়ে আছি। কেবিনটা বেশ দামি আসবাবে সাজানো। পাশের কাচের জানলার পরদাগুলো সরানো। ওর মধ্যে দিয়ে আকাশটাকে দেখতে-দেখতে বুঝতে পারলাম সাগর অশান্ত

হয়েছে দুলুনি বেড়েছে। হয়তো এ জন্যই ঘুম ভেঙে গেল। খাট থেকে ওঠার চেষ্টা করতে-করতেই বুঝতে পারলাম, গা বমি-বমি করছে। তার মানে সি-সিকনেসের উপসর্গ শুরু হয়ে গিয়েছে। কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে দাঁড়ালাম।

"লালচুলোটা হাতে পানীয়ের পাত্র নিয়ে এগিয়ে এল।

"'শুভসন্ধ্যা স্যার।'

"আমি ওর কথার কোনও জবাব দিলাম না।

"'আমাদের উপর নির্দেশ আছে আপনার কোনও যত্ন-আত্তির যেন ত্রুটি না হয়। কী দেব আপনাকে?'

"আমি ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

"'রাগ করেছেন স্যার!'

"'এত খাতিরদারির কী আছে! একবারে মেরে ফেললেই তো পারতে। আমার পরিবারকে তো শেষ করে রেখেছ।'

"চুকচুক করে জিভ দিয়ে শব্দ করল লালচুলো। তারপর পানীয়ের গ্লাসটা রাখল আমার সামনের টেবিলে।

"'ওরা ঠিক আছে এটুকু আপনাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আমরা হুকুমের চাকর স্যার।'

"'কার?'

"'ধরুন ভাগ্যের। এ চাকরি ছেড়ে দেব বলে কত চেষ্টা করলাম। পারছি কোথায়!' আফসোস ঝরে পড়ল লালচুলোর গলায়, 'জীবন আর জাহাজের অবস্থা এক রকম স্যার। ধরুন আজ। প্রথম জাহাজ ভাসানোর সময়, সাগর শান্ত ছিল। যতই এগোচ্ছি ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়ছে। তাল মিলিয়ে বাড়ছিল জাহাজের দুলুনি। আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ডেকের চেয়ারে। দুলুনির জন্য আর একটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন জলে। তাই আপনাকে পাঁজাকোলা করে নাবিকেরা ঘরে নিয়ে গেল।'

"'তোমার মালিক কে?'

"এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লালচুলো।

"'সময় এলে সব জানতে পারবেন। গা বমি করছে?'

"ও বলছে লিলিয়ানা আর ফ্লোরেট ঠিক আছে। ধাপ্পা দিচ্ছে। কী যে ধান্দাবাজি।

"জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নক্ষত্র ভরা আকাশের দিকে চাইলাম। বারান্দা দিয়ে লিলিয়ানও কি একইভাবে রাতের আকাশ দেখছে? কত রোগী অপেক্ষায় থাকবে আমার জন্য। অপেক্ষায় থাকবে আমার সার্জিক্যাল টিম। আমার ছাত্রছাত্রী। আমার গোটা হাসপাতাল।

"দুলুনি বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা।

"'স্যার, প্রতিবার ভাবি এই ভয়েজ শেষ হলে আর আসব না। কিন্তু পেটের টানে ফিরে আসতে হয়।'

"রাতের ন্যাভিগেশনের সময় এরা রেডিয়ো চালিয়েছে। রেডিয়োয় এরা আশপাশের জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে গল্প-সল্প করছে। আমার কেবিনে বসে দিব্যি শুনতে পাচ্ছি। খাবার দিয়ে গিয়েছে লালচুলো। কিন্তু দুলুনি বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বমি-বমি ভাবটা এত তীব্র হয়েছে যে, মনে হচ্ছে খাবার পেটে ঢুকলে আপনিই উগরে বেরিয়ে আসবে।

"অদূরের জাহাজটার নাম 'কুইন অফ গাল'। এটা একটা ফুল লোডেড ট্যাঙ্কার জাহাজ। ষোলো হাজার টন হাই স্পিড ডিজেল নিয়ে চলেছে। আচ্ছা, আমাদের জাহাজে কী-কী মাল আছে? নামখানা তো জম্পেশ, ইয়াসমিন। মালবাহী জাহাজ যখন নিশ্চয়ই মালপত্রে ঠাসা। যাত্রীও তো দেখছি না।

"কোনওভাবে টলতে-টলতে এদিক-সেদিক খুঁজতে-খুঁজতে পেয়ে গেলাম কুতকুতে চোখোটাকে। কফিনের সাইজের বিরাট বড়-বড় কাঠের প্যাকিং বাক্সগুলোর পাশে কী যেন করছিল। আমাকে দেখে চমকে উঠে ওর পিস্তলটা ঝটিতি বের করল। না, আমার মাথা গরম করা চলবে না। খুব শান্তভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে কিডন্যাপ করলে কেন? কী দরকার?'

"ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না তো ফরাসি কুত্তা, হামবুর্গ আসছে। জাহাজ ওখানে নোঙর করবে। এখন কেটে পড়ো।'

"আগে জবাব দাও।'

"'আমি জবাব দিই না, নিই। বুঝলে হে। পিস্তলটা পেটের কাছে গুঁজে দু' আঙুলে তুড়ি মেরে হাই তুলল কুতকুতে। আমার নাম তানাকা। বেশি কথা বলতে-শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। কেবিনে যাও।'

"দু' পা এগিয়েছি পিছন থেকে শুনলাম, 'আসছে তোমার যম। হামবুর্গ এলে মালগুলো খালাস করি আগে। তারপর তোমার সঙ্গে হেস্তনেস্ত হবে।'

"কেবিনে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল যখন, তখন একটু-একটু আলো ফুটছে কিন্তু সূর্যোদয় হয়নি। ভোরের নর্থ সি কালচে। প্রচুর হেরিং গাল উড়ে বেড়াচ্ছে ডানা মেলে। সাগরের কালো জলের মাথায় মাঝে-মাঝেই ঝিকিয়ে উঠছে সফেন ঢেউয়ের মুকুট।

"বেলা বাড়লে দেখতে পেলাম ডলফিনদের। একসঙ্গে একটা বিরাট দল চলেছে। অবসন্ন মনে চুপ করে বসে আছি ডেকে। তখন জাহাজের অন্য দিক থেকে একটা অস্পষ্ট চেঁচামেচির আওয়াজ এল। যাব কী যাব না ভাবছি। শেষে ভাবলাম, নাহ যাই। খারাপ কিছু হলে নিজের প্রাণটাও তো বাঁচাতে হবে। কেবিনের সরু প্যাসেজটা সবে পেরিয়েছি, ঝনঝন কাচ ভাঙার শব্দে কেঁপে উঠলাম।

"এর পর যা দেখলাম তাতে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

"বিশাল বড় একটা ভালুক। কুচকুচে কালো বললেও কম বলা হয়। রাতের অন্ধকার হলে সেই অন্ধকারে এই প্রাণীটা একেবারে মিশে যেত। বুকের কাছটা হালকা বাদামি এবং মাখন রঙের। ঘড় ঘড় আর হিসহিস আওয়াজ করতে-করতে সেটা এগিয়ে যাচ্ছে লালচুলোর দিকে। ব্ল্যাক বেয়ারের কথা আমি আগে শুনেছি। এরা বেশ হিংস্র হয়। এল কোত্থেকে এটা? আমি এক পা, দু'পা করে পিছু হটছি। ওদিকে জনাদশ-বারো লোক ওখানে জড়ো হয়ে গিয়েছে ভালুকটাকে একটা খাঁচায় পুরবে বলে। কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণ করে কার সাধ্য। ওজন চারশো পাউন্ডের কাছাকাছি হবে। একটা মুশকো চেহারার লোক কিছু মাশরুম আর অ্যাকর্ন রেখে

ব্ল্যাক বেয়ারের কথা আমি আগে শুনেছি। এরা বেশ হিংস্র হয়। এল কোত্থেকে এটা? আমি এক পা, দু'পা করে পিছু হটছি। ওদিকে জনাদশ-বারো লোক ওখানে জড়ো হয়ে গিয়েছে ভালুকটাকে একটা খাঁচায় পুরবে বলে।

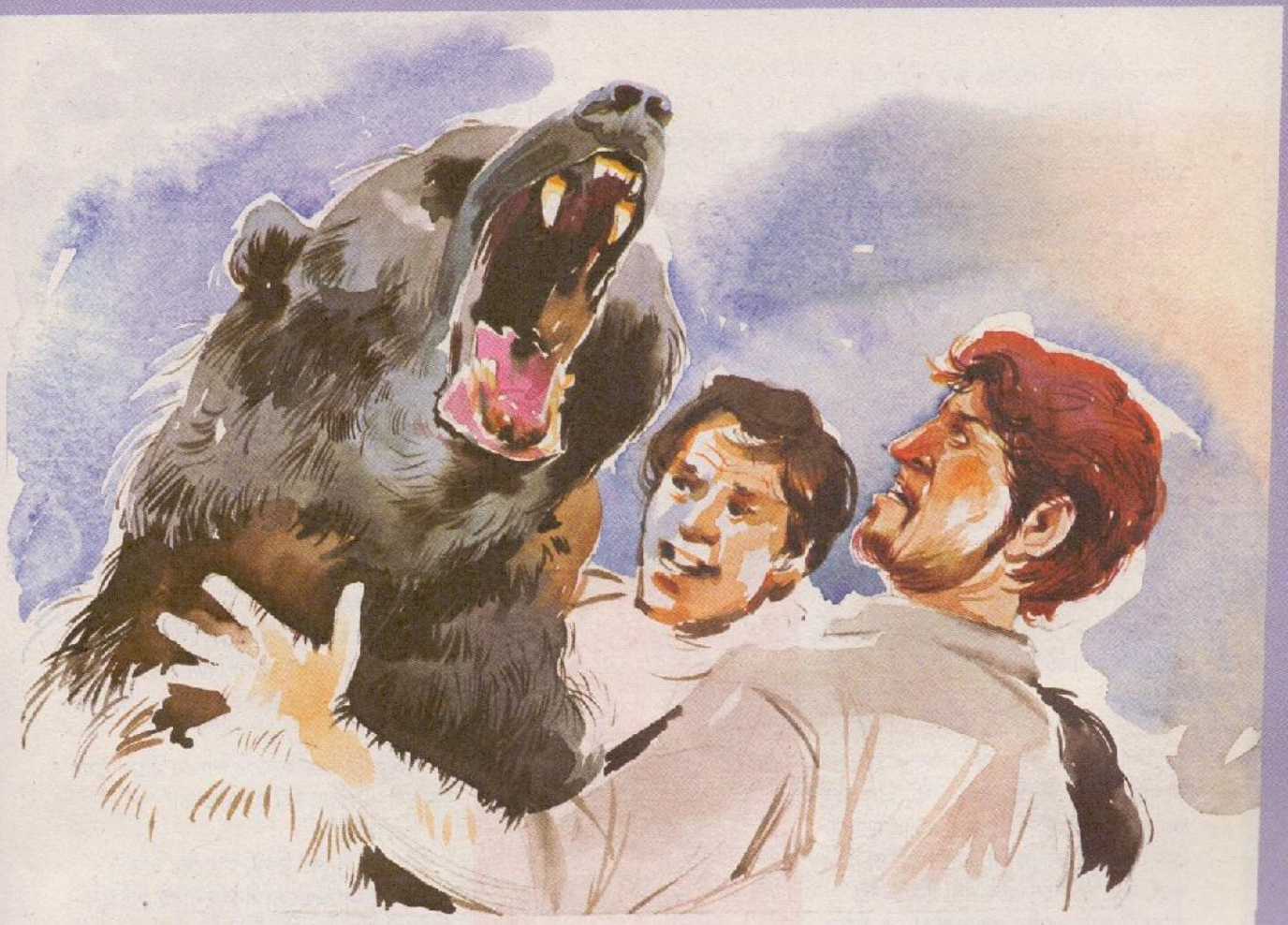

এল খাঁচাটার মধ্যে। আর-একজন প্রচুর চেরি ছুড়ে দিচ্ছে ভালুকটার দিকে। কিন্তু ওটা গ্রাহ্যই করছে না।

"'তুমি ঘরে যাও পেটিট,' চিৎকার করল তানাকা।

"ভয় পেলেও আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। আমি ধীর অথচ চপল গতিতে কেবিনের দিকে পিছু হঠছি। জাহাজ মনে হয় গতি কমিয়েছে, ভালুক বন্দির জন্য। বমি-বমি ভাবটা লাগছে না। ভালুকটার জঘন্য গর্জন শুনলাম আবার। আমি ওর আওতার বাইরে চলে এসেছি। শেষ ক' পা এক রকম দৌড়ে কেবিনে ঢুকে পড়লাম। ল্যাচ টেনে ডাবল লক করে দিয়েছি। কিন্তু চারশো পাউন্ড ওজনের কোনও ভারী প্রাণীর ধাক্কা সামলানোর মতো মজবুত দরজা এটা নয়। জানলার কাছে গিয়ে পাল্লা খুলে দেখতে গেলাম। সেরকম হলে ভালুকের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যাবে। জানলা দিয়ে দেখি জাহাজটা কোনও বন্দরের কাছে এসে পড়েছে। ডকের নামটা দেখার জন্য দেওয়ালে ঝোলানো বাইনোকুলারটা হাতে নিলাম। জার্মান ভাষায় কিছু লেখা আছে। হামবুর্গ কি এত তাড়াতাড়ি এসে গেল? বাইরে আবার গুলির শব্দ। মনে হচ্ছে ভালুকটাকে এখনও বাগে আনা যায়নি।

"প্রচণ্ড চেঁচামেচি এবং হই-হট্টগোল হচ্ছে। আমার দরজায় দুম দুম করে কারা ধাক্কা দিচ্ছে।

"ডক্টর শিগগির আসুন। বীভৎস কাণ্ড।'

"কী ব্যাপার? দরজায় তিন-চারজন উদভ্রান্ত নাবিক।

"গিয়ে দেখি ভালুকটা উন্মত্তের মতো লাফাচ্ছে। এক আঁচড়ে লালচুলোর খুলি খুলে দিয়েছে। করোটির উপর থেকে লাল চুলশুদ্ধ চামড়া অর্ধেক খুলে গুটিয়ে পড়েছে মুখের উপর।

"ভালুকটারও আঘাত লেগেছে। আহত অবস্থায় লালচুলো দিয়েছে বন্দুক চালিয়ে। কী-ই বা করবে। আত্মরক্ষা তো সমস্ত প্রাণীর ধর্ম। ভালুকটার বা কাঁধে গিয়ে লেগেছে বুলেটটা। বন্য জন্তু আহত হলে আরও সর্বনেশে হয়ে ওঠে। ভাগ্য ভাল যে একে খাঁচার মধ্যে ঢোকানো গিয়েছে। তার ভিতরেই দাপাদাপি করছে। লালচুলোর এই অবস্থা আর দেখা যাচ্ছে না।

"'ওকে বাঁচান স্যার,' কাতর অনুনয় করল একজন।

"'গরম জল হবে একটু? আর গ্লাভস চাই। স্পিরিট থাকলে দাও,' আমি এগিয়ে গেলাম।

"'এক্ষুনি আনছি।'

"গ্লাভস মিলল না। এটা মালবাহী জাহাজ বলে কি এদের ফার্স্টএডের সরঞ্জামটুকুও থাকতে নেই? স্পিরিট দিয়ে হাত ধুয়ে লালচুলোর করোটিটা ধরলাম। খুব একটা রক্তপাত হয়নি। তার মানে প্রধান শিরা ধমনীগুলো ঠিকঠাক আছে। রুমালটা তরল ওষুধে ভিজিয়ে ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম।

"'একে বন্দর হাসপাতালে পাঠাতে হবে। মাথায় সেলাই

লাগবে। না হলে এত বড় ক্ষত জুড়বে না।'

"'হ্যাঁ-হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন ফোন করে দিচ্ছে।'

"ভালুকটা তখনও বিশ্রীভাবে দাপাচ্ছে। আসলে ও তো ব্যথায় মরছে।

"'খুব একটা গুরুতর ইনজুরি তোমার নয়। ভয় পেলে আরও খারাপ হবে তোমার শরীর। সাহস রাখো,' লালচুলোর অসহায় চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে বললাম। গোলমালে এর নামটাই জানা হয়নি।

"কানফাটানো একটা আওয়াজ এবার আমায় নড়িয়ে দিল। লালচুলোর মাথা লক্ষ করে এক টিপে গুলি মেরেছে একটা লোক। অত্যন্ত সাধারণ চেহারা। ন্যাড়া মাথা। বেঁটেখাটো। তবে কেন জানি না, বেশ চেনা-চেনা লাগল।

"'নে তোর ক্ষত একেবারে জুড়িয়ে দিলাম,' হাসতে-হাসতে বলে অবলীলাক্রমে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে চলে গেল লোকটা।

"চারিদিকের আতঙ্কিত দৃষ্টির মধ্যে বসেও আমার ধন্দ কাটছিল না।

"কে বেশি হিংস্র? কালো ভালুকটা নাকি এই বেঁটে লোকটা?"

॥ ২২ ॥

"'বলিহারি তোর সাহস। অবাক হয়ে যাই। কী দামি প্রাণী এই হিমালয়ান বেয়ার। আর তুই ওর গায়ে গুলি ছুড়িস? অ্যাঁ? এটা অ্যাডাল্ট মেল। এরকম ভালুক পাওয়াই যায় না। কী কষ্টে, কত সন্তর্পণে একে ধরা হয়েছে তা আমরাই জানি। এখন এর শুশ্রূষা কে করবে, তোর বাপ?'

"বেঁটে লোকটা ডেকে পায়চারি করতে-করতে আস্ফালন করছিল। জাহাজ হামবুর্গে নোঙর করেছে।

"'আজই একে চিড়িয়াখানায় পাঠানোর কথা ছিল আমার। অ্যাই রাস্কেল, ইদিকে আয়।'

"একজন কেবিন বয় ছুটে এল।

"'লাশটা সরা তাড়াতাড়ি। হল্লা করলে কিন্তু তোরও এক হাল হবে।'

"বয়টা ঘাড় কাত করে নিঃশব্দে সরে গেল।

"'খুব ফেলো ফিলিং দেখানো হচ্ছে, না বাছাধনেরা? অন্যের দুঃখে কাতর। তোদের এক-এক করে ওই ভালুকের খাঁচায় না ফেলেছি তো আমার নাম নাকামুরা নয়।'

বলাবাহুল্য যারা আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, এই উক্তিটা তাদের উদ্দেশে।

আধঘণ্টা পরে নাকামুরা আমার কেবিনে এল।

কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা আমার তখনও হজম হয়নি। আমি চুপচাপ ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়েছিলাম।

"'ডাক্তার আপনাকে একটা বিশেষ কাজে এনেছি।'

"আমি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।

"'আপনি তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বানান বলে শুনেছি।'

"'ভুল শুনেছ।'

"'আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। আপনি হাত বানান না?'

"'ও, সে তো যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় যারা হাত হারিয়ে ফেলে তাদের জন্য। বায়োপ্রস্থেসিস ইন ওয়্যার ভিক্টিমস। চেষ্টা করি যাতে স্বাভাবিক হাতের মতো কোনও ইমপ্ল্যান্ট দেওয়া যায়।'

"'দেখুন আপনি বড় সার্জেন হতে পারেন কিন্তু আমায় বোকা ভাববেন না। এ বিষয়ে আমিও কিছু লেখাপড়া করেছি। হাত প্রতিস্থাপন মানে চাট্টিখানি কথা নয়। মানুষের কাঁধের অ্যানাটমি সম্বন্ধে আপনার অগাধ জ্ঞান, এটা আমি বুঝি। ভগবানের দূত আপনি।'

"আমি বুঝতে পারলাম না ও কী বলতে চায়। প্রশংসা করছে নাকি নিন্দা!

"'যে হিউমেরাস, রেডিয়াস, আলনা দিয়ে মানুষের হাত তৈরি হয়েছে ওই একই হাড় দিয়ে পাখিদের ডানা। কী, ভুল বললাম?'

"হাতের হাড়ের নামগুলো কেমন পটাপট বলে গেল অথচ এই লোক বিনা দোষে একজনকে খুন করেছে একটু আগে। ধুরন্ধরের একশেষ।

"'আপনি হাত বানাতে পারেন মানে ডানা বানানো আপনার কাছে জলভাত।'

"'হোয়াট?'

"'কেন, পাখির ডানা, মানুষের হাত, তিমির ফ্লিপার এগুলো সবগুলোরই তো এক শোল্ডার জয়েন্ট থেকে উৎপত্তি। তা হলে হাত ডানা হতে অসুবিধেটা কোথায়?'

"'কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।'

"'আমায় আপনি এখনও চিনতে পারেননি ডাঃ ফ্রেডরিক পেটিট। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবটা এককথায় উড়িয়ে দিলেন। হুঁ?'"

"ধাঁ করে মনে পড়ে গেল পুরনো স্মৃতি। প্যারিসে হ্যান্ড সার্জেনদের একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছিল। আমার ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রেজেন্টেশন করার কথা ছিল 'বায়োপ্রস্থেসিস ইন ওয়্যার ভিক্টিমস: রিবিল্ডিং এ হ্যান্ড ফ্রম নাথিং'। সেমিনারে যার বিষয়বস্তু যত আকর্ষণীয় হবে, তার তত বেশি পয়েন্ট। আর চূড়ান্ত পয়েন্ট মিলে গেলেই পুরস্কার।

"আমার অধীনে দু'জন ডাক্তার আছেন দে লা জ্যঁভ ইন্সটিটিউটে। দু'জনেই কমবয়সি আর পুরস্কারপাগল। ওদের সঙ্গে একবার আমি আলোচনা করেছিলাম থিয়োরিটিক্যালি মানুষের হাতকে ডানায় রূপান্তর করা যায় কী যায় না! করলে কী-কী অসুবিধে আর সুবিধে হতে পারে। ওরা দু'জন আমাকে প্রস্তাব দিল যে আমাদের প্রেজেন্টেশনটায় চমক আনতে হলে এই বিষয়টা ঢোকানো দরকার। তা হলে চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষ আমাদের কাজ সম্পর্কে উৎসাহী হবে। এতে প্রচার এবং পুরস্কার দুই-ই মিলবে।

মানুষের হাতকে ডানায় রূপান্তর করা যায় কী যায় না! করলে কী-কী অসুবিধে আর সুবিধে হতে পারে। ওরা দু'জন আমাকে প্রস্তাব দিল যে আমাদের প্রেজেন্টেশনটায় চমক আনতে হলে এই বিষয়টা ঢোকানো দরকার।

"আমি কিন্তু এই প্রস্তাবে একদম রাজি ছিলাম না। আমার অনুমান ছিল এই বিষয়টা বহু লোকের কাছে এত স্পর্শকাতর এবং স্বপ্নালু যে, ডানার লোভে একটা হইচই সৃষ্টি হয়ে তুমুল গন্ডগোল হবে। আমি আপত্তি জানালাম। ওরা তবু ক্রমাগত ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল। শেষে আমি কিছুটা বিরক্ত হয়েই সম্মতি জানালাম।

"তারপর তো ইতিহাস। ফার্স্ট প্রাইজ পেলাম তো বটেই, তা ছাড়া সেমিনারটা হওয়ার পর যত প্রতিবন্ধী লোক হাতের আশায় আমাদের কাছে এলেন তার চেয়ে প্রায় একশোগুণ বেশি মানুষ এলেন ডানার আবদার নিয়ে। পাগলের মতো অবস্থা আমাদের। পপ সম্রাজ্ঞী ভেনিস থেকে শুরু করে নামী ফুটবলার পল রোনাল্ডো, সেনেটর থেকে চিত্রতারকা, ব্যাঙ্ককর্তা থেকে অধ্যাপিকা, অ্যাকাউন্ট্যান্ট থেকে কলেজ ছাত্র, কে নেই এই তালিকায়। সবার ডানা চাই। একজোড়া করে রঙিন ডানা। উঃ। হাঁসফাঁস করে দম আটকানোর জোগাড়।

"'এইবার তোমায় মনে পড়েছে। একদিন আমার চেম্বারে তুমি এসেছিলে। তুমি প্রস্তাব দিয়েছিলে তোমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজনের হাতকে ডানায় রূপান্তর করতে। হ্যাঁ কাজটার জন্য অনেক বেশি পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলে তুমি। আমি হাসছিলাম। হাসা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারতাম তখন। তোমার মতো পাগলদের বুঝিয়ে-বুঝিয়ে আমি তখন ক্লান্ত যে, মানুষের হাতদুটো বাদ গেলে তাদের শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। হাঁটাচলা, দৌড়ঝাঁপ সব কিছুই বিপর্যস্ত হবে। ডান হাত হোক কী বাঁ হাত, হাতের সূক্ষ্ম ব্যবহার যেদিন থেকে মানুষ শিখেছে, সেদিন থেকে সে তার সমসাময়িক চতুষ্পদী জন্তুদের থেকে উন্নত হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিতে। ডানা কখনও হাতের বিকল্প হতে পারে না। তা হলে পাখিরা আজ মানুষকেও বুদ্ধির জোরে ছাড়িয়ে যেত। তুমি তখন একটা আজব ঘটনা বলেছিলে, যেটার জন্য তোমায় ভুলিনি।

"'হাত বাদ দেবেন কেন? হাতও থাকবে, ডানাও। আমি ইনফ্যাক্ট এরকম কিছু মানুষ দেখেছি।'

"'আমি ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি যে, তুমি একটি বদ্ধ পাগল। কাজের সূত্রে মাঝে-মাঝে এরকম কিছু উন্মাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তুমি বলে চললে সেই সব মানুষের কথা। নিজের চোখে নাকি দেখেছ এদের। তুমি বলেছিলে, তিব্বত সীমান্তে মাঝে-মাঝে এদের উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকজন ভাবে এরা দেবদূত, কিন্তু আদপেও এরা পরি নয়। তুমি এটাও বলেছিলে যে, আমি ইচ্ছুক থাকলে তুমি আমাকেও ওই উড়ন্ত মানব দেখাবে। খটকা লেগেছিল তোমার ব্যবহারে। এত স্বাভাবিক কথাবার্তা, আচার-আচরণ আর তার মধ্যে তোমার ওই উড়ন্ত মানবের কাহিনিকে পুরোপুরি অসত্য বলে মনে হচ্ছিল না। সেদিন থেকেই তোমাকে মনে আছে আমার। তোমার ওই বেঁটেখাট ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা, খয়েরি চোখ আর গালের কাটা দাগটা। কথায়-কথায় চেক বই বের করে খস খস করে মিলিয়ন ডলারের অঙ্ক লেখা। তবে তোমার নামটা তুমি গোপন রেখেছিলে। এতদিনে জানলাম। নাকামুরা, আমি তোমাকে চিনেছি। কিন্তু আমাকে এভাবে ধরে এনেছ কেন?'

"'কারণটা জলের মতো পরিষ্কার ডাঃ ফ্রেডরিক পেটিট। আপনিও তো যে সে লোক নন। মিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে পারে ক'জন? তাই আপনাকে দিয়েই হবে।'

"'বাঁচার জন্য জীবনে টাকা খুবই দরকারি। কিন্তু এত জরুরি নয় যে, তা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। নাকামুরা একটা কথা তোমায় পরিষ্কার করে বলি, চিকিৎসা করে যখন কোনও প্রতিবন্ধী মানুষকে তার হারানো হাত ফেরত দিই, তখন যা তৃপ্তি হয় তার দাম তোমার মিলিয়ন কেন, বিলিয়ন কী ট্রিলিয়ন ডলারও চোকাতে পারবে না।'

"'সে জন্যই তো আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি এক বিশেষ জায়গায়।'

"'কোথায়?'

"'আপাতত আমরা হামবুর্গে। এখানে আজকের দিনটা থেকে আগামিকাল রওনা হব।'

"'এত ধোঁয়াশায় রেখেছ কেন আমায়? আমার পরিবারকে কেন বন্দি করে রেখেছ?'

"'কে বলল অত্যাচার করছি? নাকামুরা সে মানুষ নয়,' উত্তেজনায় ওর মুখ ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। কান লাল। তীক্ষ্ণ শিস দিল এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তানাকা হাজির।

"'ফোন লাগা পেটিটের বাড়ি।'

"লিলিয়ানকে পেয়ে গেলাম ওপারে। গলাটা আগের দিনের মতো অতটা ক্লিষ্ট নয়।

"'তুমি ঠিক আছ তো?' লিলিয়ান হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

"'ভাল। তোমার হাতের অবস্থা কেমন? হাড় ভেঙেছে নাকি?'

"'না-না টানাটানিতে একটু কালশিটে পড়েছে। তুমি কোথায়?'

"বলা নিষেধ আছে,' আমি আড়চোখে নাকামুরাকে দেখে নিলাম, 'ক্লোরেট ভাল আছে?'

"'ও ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে। ডেকে দিই, তোমার সঙ্গে কথা বলুক।'

"'না-না লিলি, মেয়েকে ডাকার দরকার নেই। ওকে বোলো ওর বাবা সুস্থ-স্বাভাবিক আছে। সময় হলে ফিরে আসবে। তোমাদের চলছে কীভাবে? খাওয়াদাওয়া? ব্যাঙ্কেও তো যেতে পারছ না।'

"'সে ব্যবস্থা এরা করেছে। লোকগুলো আমাদের বেরতে দেয় না। তাই সব কাজ নিজেরা করে দিচ্ছে।'

"আমার হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে নাকামুরা বলল, 'দেখলেন তো! এত দুশ্চিন্তা কিসের?'

"এই তিনদিনের মধ্যে এতক্ষণে আমার মনের কিছুটা ভার কমেছে।

"'নাকামুরা, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে আমার লাভ কী?'

"আপনি তো দেখছি আমার চেয়েও ঝানু ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন ডাঃ পেটিট।'

"'প্লিজ, আমার কাজটা কী সেটা বলো।'

(ক্রমশ)

ছবি: কুনাল বর্মণ

মহারাণী ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়

বহু পুরনো কোচবিহারের এই স্কুলটির খ্যাতির কথা জানে গোটা জেলার মানুষ। কিন্তু না জানা কথাও তো থাকে কিছু। লিখেছেন **নিজস্ব প্রতিনিধি**

কোচবিহারের মহারানি সুনীতিদেবী ও তাঁর স্বামী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন উনবিংশ শতকের দু'জন উদ্যমী মানুষ। যে-কোনও লক্ষ্যের দিকে এগোতে গেলে আত্মবিশ্বাস চাই, চাই এক জোরালো পুঁজির জোর। শিক্ষা ছাড়া সেই পুঁজি আর কিসে মিলবে? ভারতের মেয়েরা যে সে সময়ে পিছিয়ে ছিলেন বড্ড। অন্দরমহলের অন্ধকারের আড়ালেই ঢেকে ছিলেন সম্পূর্ণ। বেশ কিছু সদাশয় ইংরেজ মেয়েদের এগিয়ে আসার জন্য, মাথা তুলে সসম্মানে দাঁড়াবার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্বদেশিরাও কম সচেষ্ট হননি কিন্তু। সেরকমই এই দম্পতি কোচবিহারের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অনেক দৃষ্টান্ত রেখেছেন। বেশ ক'টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা। সেগুলোর মান আজও শিক্ষার অঙ্গনে তাঁদের গৌরব ধরে রেখেছে। আজও এই অঞ্চলের মানুষের কাছে এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। এঁদেরই পুত্রবধূ মহারানি ইন্দিরাদেবী। এই পরিবারে বিয়ে হয়ে আসার পর পরিবারের ঐতিহ্যটি বহন করেছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল হাতে। ১৯৩৫ সালে তৈরি এই স্কুলটি তাঁরই স্বপ্নের এক ফুল। প্রথমে স্কুলটি ছিল প্রাথমিক স্তরেই, চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। তারপর ক্রমোন্নতির পর্ব পেরিয়ে সেই ছোট্ট একরত্তি স্কুল একসময় হল ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম আর এখন সেটি পুরোদস্তুর দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুধু কলা বিভাগেই উচ্চমাধ্যমিকে লেখাপড়া করা যেত। এখন বিজ্ঞানবিভাগেও সুযোগ প্রসারিত। ২০১০ সালে স্কুলের ৭৫ বছর উদযাপিত হয়েছে। এত পুরনো একটি স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ সময়ের উত্তাপ। সেটির আঁচেই প্রাণবন্ত রয়েছে স্কুলটির এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি। প্রধান শিক্ষিকা মাধুরী চট্টোপাধ্যায় একসময়ে এই স্কুলেই পড়েছেন। প্রতিবেদকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে ফুটে উঠেছে স্কুলের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ব আর অবশ্যই আগাগোড়া বিছিয়ে আছে এক মধুর নস্ট্যালজিয়া। তাঁর মুখেই শোনা গেল, শৃঙ্খলা আর সময়ানুবর্তিতা এই স্কুলের ভরকেন্দ্র ছিল, এখনও বিচ্যুত হয়নি একটুও। জীবনের এই গোড়ার কথাগুলো মেনে চললে তার ফলও যে মেলে কতটা, তার হাতেগরম প্রমাণ রয়েছে বছরশেষের ফলাফলে। গত বছরই প্রথম এই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার ছাত্রীরা পাশ করে বেরিয়েছে। প্রথম ব্যাচ! আর এই প্রথমবারেই তাদের রেজাল্ট চমকে দিয়েছে গোটা কোচবিহার জেলাকেই। কেননা এই প্রথম ব্যাচের রেজাল্ট যে টপকে গিয়েছে এখানকার নতুন-পুরনো সব ক'টি স্কুলকেই। বর্তমানে সাড়ে এগারোশো ছাত্রীসংখ্যার স্কুলটিতে রয়েছে সময়ের সঙ্গে, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে উন্নত করার সব রকম ব্যবস্থা। সম্পূর্ণভাবে সরকারি স্কুলটিতে ফুলটাইম শিক্ষিকার সংখ্যা

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়

বেশ কম, মাত্র ১৬জন। সেই কারণে আগের সেকশনগুলো এক করে ফেলা হয়েছে। তাতেও ১৭টি ইউনিট। দিনে দশজন শিক্ষকও থাকে না কখনও-কখনও। তবে স্কুলের প্রতি পুরনো ছাত্রীদের ভালবাসা খাঁটি। কারণ এখানে চারজন শিক্ষিকা আছেন, যারা এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। নিয়োজিত না হয়েও স্রেফ মনের টানেই এখানে শিক্ষকতা করেন। স্কুলের পরিকাঠামো মোটামুটি সন্তুষ্টিদায়ক। ল্যাবরেটরি, হলঘর বেশ ভাল। তবে লাইব্রেরিটি দেখাশোনার জন্য লাইব্রেরিয়ানের অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে অফিসস্টাফ, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টেরও। কোনও এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলে গিয়েছিলেন, ইচ্ছে থাকলে উপায়ের অভাব হয় না। তাই এত শত অভাবের মধ্যেও স্কুলের লেখাপড়ায় কোনও বাধা হয় না। কেননা স্কুলঅধ্যক্ষার অনুরোধে আশপাশের জেনকিনস স্কুল, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুল থেকে অনেক সময় শিক্ষক এসে এখানে প্রয়োজনমতো ক্লাস নিয়ে যান। মাধ্যমিকে বা উচ্চ মাধ্যমিকে কেউই ফেল করে না। ৭৫ শতাংশের উপর ফার্স্ট ডিভিশনের রেকর্ড রয়েছে এই স্কুলে। ত্রুটি নেই অন্যান্য ব্যাপারে। সরকারি হওয়ায় স্কুলে ব্যবস্থা রয়েছে মিডডে মিলের। তার মান নিয়ে প্রধান শিক্ষিকা যথেষ্ট প্রত্যয়ী। লেখাপড়া ছাড়াও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বেশ আগ্রহ ছাত্রীদের। স্কুল ম্যাগাজিনটি তাদের সৃজনশীলতার আয়না। শিক্ষিকাদের উৎসাহের কথা না বললে তো পুরোটা বলা হয় না। প্রায় প্রতিটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া থেকে স্কুলের নিজস্ব স্পোর্টস...উৎসাহের পরিধিটা বেশ বড়ই। খেলাধুলোতে ক্যারাটের কথা আলাদ করে উল্লেখ্য। এখনকার যা দিনকাল, তাতে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজেকে সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নটি প্রতিনিয়ত উঠে আসে। সেই ভাবনাতেই স্কুলে রুটিন মেনে ক্যারাটে শেখানো হয়। ক্যারাটেতে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় স্কুলের ছাত্রীরা সোনা এবং রুপোর মেডেলজয়ী হয়েছে। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আয়োজিত কলাউৎসবে জেলাভিত্তিক স্তরে চারটি বিভাগের তিনটিতেই এই স্কুলের ছাত্রীরা টেক্কা দিয়েছে অন্য স্কুলের সতীর্থকে। স্কুলের খ্যাতি হাওয়ায় ভেসে পৌঁছে গিয়েছে জেলার গঞ্জেগ্রামে। মাথাভাঙা, তুফানগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, হ্যামিলটন গঞ্জ, কলাঘাটা, দিনহাটার মতো দূরদূরান্ত থেকে মহারানি ইন্দিরাদেবীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়তে আসে ছাত্রীরা। এখানে রয়েছে কম্পিউটারের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থাও। একজনের মানুষ গড়ার স্বপ্ন আজ ছড়িয়ে গিয়েছে অনেক নতুন চোখে। মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে। এভাবেই তো স্বপ্নের নতুন জন্ম হয়। "এই স্কুলে যারা পড়ে, তারা সত্যিকারেরই একটা ভাল দিশাতে গিয়ে পৌঁছতে পারে।" প্রধান শিক্ষিকার দৃঢ় কণ্ঠস্বরে পাওয়া গেল এক শতাব্দীপ্রাচীন স্কুলের সময়ের লড়াই পেরিয়ে টিকে থাকার প্রত্যয়ের আভাস।

সাতটি উপন্যাস: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদার, ঋতা বসু, পারমিতা ঘোষ মজুমদার, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ বসু, মণিশঙ্কর দেবনাথ
সম্পূর্ণ ফেলুদা কমিক্স: নয়ন রহস্য • রহস্য কমিক্স: গোগোল কোথায় • রাপ্পা রায় কমিক্স: রাপ্পার ছোট্ট অ্যাডভেঞ্চার • ছোটগল্প: সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী
প্রচেত গুপ্ত, অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী, নবনীতা দত্ত, সুবর্ণ বসু, সিজার বাগচী • ফিচার • কুইজ • শব্দসন্ধান • খেলাধুলো

ইতালিতে ভূমিকম্প

সকালবেলায় ভূমিকম্পের দুলুনিতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল মধ্য ইতালির ছবির মতো পাহাড়ি শহর আমাত্রিস এবং আরাকাতো। ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে তিনশো জনেরও বেশি মানুষের। আহত প্রায় আড়াই হাজার জন। আপাতত খোলা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন দুর্গতরা। তবে আফটার শক বেশ জোরদার হওয়ায় আতঙ্কে রয়েছেন মানুষজন।

সিরিজ় হারল ভারত

টেস্ট সিরিজ় জিতলেও, বৃষ্টিবিঘ্নিত টি২০ সিরিজ়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের কাছে ১-০ ফলে হেরে গেল ভারত। দুই দেশের মধ্যে টি২০ সিরিজ়ের আয়োজন করা হয়েছিল আমেরিকার ফ্লোরিডার লডারহিলে। প্রথম ম্যাচে ২৪৫ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র এক রানে ম্যাচটি হেরে যায় ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হয়েও বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়।

শেষ হল রিও অলিম্পিক্স

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হল ২০১৬-র রিও অলিম্পিক্স। কুস্তিতে সাক্ষী মালিকের ব্রোঞ্জ আর ব্যাডমিন্টনে পি ভি সিন্ধুর রুপো রিও অলিম্পিক্সে এই দুটোই ভারতের পদক প্রাপ্তি। এবারও পদক তালিকায় শীর্ষে রইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৪৬টি সোনা সহ মোট ১২১টি পদক পেয়েছে তারা। দ্বিতীয় স্থানে গ্রেট ব্রিটেন। ২৭টি সোনা সহ তাদের মোট পদক ৬৭টি। ২৬টি সোনা সহ মোট ৭০টি পদক জিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে চিন। ২৭টি বিশ্ব রেকর্ড এবং ৯১টি অলিম্পিক্স রেকর্ড হয়েছে রিও অলিম্পিক্সে। ২০৭টি দেশ এবার অংশগ্রহণ করলেও পদক তালিকায় নাম তুলতে পেরেছে মাত্র ৮৭টি দেশ। চার বছর পর অলিম্পিক্সের আসর বসবে জাপানের টোকিওয়।

ইসরোর নতুন পালক

বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে সুপারসনিক কমবাসান র‍্যামজেট বা স্ক্র্যামজেট রকেট ইঞ্জিনের সফল উৎক্ষেপণ করল ইসরো। এই রকেটের বিশেষ সুবিধে হল, এটি বায়ুমণ্ডলের থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে আর শব্দের ছয়গুণ গতিবেগ নিয়ে মহাকাশে ছুটতে পারে। এই রকেটে শুধু হাইড্রোজেন জ্বালানি বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ফলে রকেট উৎক্ষেপণের খরচ দশগুণ কমে যাবে।

ওনাম উৎসব

কেরলের সবচেয়ে বড় উৎসব ওনাম শুরু হবে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিন ধরে চলবে এই উৎসব। মালায়লম ক্যালেন্ডার 'কোলাবরষম' অনুযায়ী বছরের প্রথম মাস হল 'সিংহম'। সিংহম মাসের প্রথমদিন অর্থাৎ নববর্ষের দিন থেকেই এই উৎসব শুরু হয়। যদিও উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় দিনদশেক আগে 'অথম' থেকে। বাড়ির সামনে বিভিন্ন রঙের ফুলের পাপড়ি দিয়ে আলপনা সাজানো এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। নতুন জামাকাপড় পরে প্রার্থনা, পুজো সেরে পরিবার পরিজন মিলে ঐতিহ্যপূর্ণ নাচে, গানে উৎসবে মেতে ওঠে গোটা রাজ্য। উৎসবের দ্বিতীয়দিনটি 'থিরু ওনাম' বা থিরুভোরাম (পবিত্র ওনাম) হিসেবে পালিত হয়।

হোয়াইট হাউজ়ে বাঙালি কবি

জন্ম কলকাতায়। মাত্র ছ'বছর বয়সে আমেরিকায় পাড়ি। এখন টিনএজের প্রান্তে পৌঁছে সেদেশের তরুণ কবিদের মধ্যে অন্যতম স্থান করে নিয়েছেন কলেজ পড়ুয়া লগ্নজিতা মুখোপাধ্যায়। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর মিশেল ওবামার আমন্ত্রণে 'স্টুডেন্টস পোয়েট্রি সেলিব্রেশন' অনুষ্ঠানে হোয়াইট হাউজ়ে কবিতা পড়বেন লগ্নজিতা। গত এপ্রিল মাসে লগ্নজিতার কবিতার বই 'দিস ইজ় আওয়ার ওয়ার' প্রকাশ হয়েছে। টেনেসি প্রদেশের 'ইয়ুথ পোয়েট লরিয়েট' এবং ন্যাশভিলের 'পোয়েট অ্যাম্বাসাডর' সহ আরও নানা সাম্মানিক খেতাব পেয়েছেন তিনি। কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গীতচর্চা, গ্রুপ থিয়েটারে নাটক করা সব কিছুই করছেন লগ্নজিতা।

বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস

২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘ ১৫ সেপ্টেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস হিসেবে মান্যতা দেয়। পরের বছর থেকে দিনটি পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সৎ প্রচেষ্টা চালাবেন, এই কথাই দিনটি পালনের প্রধান উদ্দেশ্য। এবারের দিনটির মূল ভাবনা হল, নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পারবেন পৃথিবী থেকে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করে মানুষকে শান্তি, স্বস্তি আর সহাবস্থানের পথে চালিত করতে।

লোক দেখলেই ঘরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করে। কেন?

তিতিরের মা এই নিয়ে ওকে বকে-বকে হদ্দ। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে তিতির ঘরে গিয়ে বসে থাকবে। যতক্ষণ না ডাকা হচ্ছে, কিছুতেই বেরবে না। বেরলেও একটু কাষ্ঠ হেসে আবারও নিজের শিবিরে ফিরে যাবে। ইদানীং তো এমন হয়েছে বিয়েবাড়িতে বা জন্মদিনেও যেতে চায় না। লোকজন একটুও পছন্দ করছে না। এটা তো ঠিক নয়। কী করে পালটাবে তিতির নিজেকে?

যখন মানুষ অন্য কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না, তাকে সোজা কথায় অসামাজিক বলে। তিতিরের ব্যবহারটা এই অসামাজিক গোত্রেই পড়ছে। ছোট বলে ভব্যতা জানবে না, এমনটা নয় কিন্তু। মানুষ একা থাকতে চায় না বলেই অনেকে মিলে দল বেঁধে থাকতে শুরু করেছিল। সেসব ছিল সভ্যতার শুরুর কথা। সেই থেকেই তো সমাজের পত্তন। চিরকাল একসঙ্গে থাকতে গেলে অনেক রকম অসুবিধে হয়। কারও কথা পছন্দ হয় না। কারও কাজ দেখলে ব্রহ্মতালু দিয়ে আগুন ছোটে। কারও চোখের ভাষায় মনে হয়, ও আমাকে ঠিক ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু শুধু একা-একা তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। বা এমন পৃথিবীতেও বাঁচতে পারে না, যেখানে শুধু পছন্দের লোকেরাই রয়েছে। সকলের সঙ্গে মিলেজুলেই থাকতে হয়। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে কাটানো সময়ে বা যার যা ভালবাসার সময় রয়েছে, সেইসব মুহূর্ত থেকে টুকরো-টুকরো ভাললাগা কুড়িয়ে নিতে হয়। সমস্ত রকম খারাপ লাগাগুলো এই নিজস্ব ভাল লাগায় ঢেকে রাখতে হয়। ইচ্ছে না করলেও লোকের সঙ্গে মিশতে হয় নিজের মতো করেই। ধরো, তুমি বেশি কথা বলতে ভালবাস না। বোলো না। অল্প বলো। কিন্তু উপস্থিত থাকো। বেশিক্ষণ ইচ্ছে করছে না। আধঘণ্টা থাকো। তিনি যাওয়ার সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াও। এর নামই সৌজন্য। সমাজে টিকে থাকার এক কর্তব্য। এরকম দরজা বন্ধ করে চারদিকে গণ্ডি কেটে রাখলে কখনও এই গণ্ডি থেকে বেরতেই পারবে না। হয়তো একদিন তোমার ইচ্ছে করবে কারও সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু ততদিনে অনভ্যাসে মুখ থেকে কথাটাই ফুটে উঠবে না। আমরা চেষ্টা করব এমন দিনটা যেন তিতির কেন, আমাদের কাউকেই কখনও না দেখতে হয়।

সুদেষ্ণা ঘোষ

আমার বই

তুতুল

মাত্র ক'দিন আগেই প্রয়াত হলেন মহাশ্বেতাদেবী। এ যুগে যাঁদের কলম ছিল সবচেয়ে ধারালো, তাঁদেরই একজন ছিলেন মহাশ্বেতাদেবী। তাঁর বেড়ে ওঠার আবহ তৈরি করেছিল তাঁর পরিবার, সে আমলের এক বিদগ্ধ বাড়ি। শিল্পের বিভিন্ন পরিসরে তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যই দারুণ খ্যাতিমান। মহাশ্বেতাদেবীর প্রায় সমবয়সি কাকার কথা রয়েছে বই জুড়ে, তিনি ঋত্বিককুমার ঘটক, বাংলা ফিল্মজগতের এক অত্যন্ত মেধাবী মানুষ। যাই হোক, এই বইটি যাঁকে নিয়ে লেখা, তিনি মহাশ্বেতাদেবীর বাবা, মনীশ ঘটক। যুবনাশ্ব ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন। 'কল্লোল' নামের এক নামী কাগজের অন্যতম ব্যস্ত লেখক ছিলেন তিনি। কিন্তু এমনিতে ভারী মজার মানুষ ছিলেন এই যুবনাশ্ব। মান্ধাতার বাবার নামে নিজের ছদ্মনাম ধার করেন। প্রতিভাবানরা যেমন খ্যাপাটে হয় আর কী! মহাশ্বেতা বাবাকে তুতুল নামে ডাকতেন। এই তুতুলকে নিয়েই তিনি লিখেছেন বইটি। সেরকম নামডাক না থাকলেও এই বইটি খুঁজে পড়তে পারলে তোমাদেরই বিস্তর লাভ। মানুষগুলো, সমাজ অনেক পুরনো হলেও লেখার গুণে ভারী মনকাড়া। যেমন সরস ভাষা, তেমনি এই বইয়ের ঘটনাগুলোর আকর্ষণ। নিছক গল্পের লোভেই বইটি একটানা শেষ করা যায়। যেমন ধরো, তখন তুতুল হস্টেলে পড়েন। কলকাতায় দাঙ্গা বাঁধল। বন্ধুকে এগিয়ে দিতে নীচে নেমেছিলেন শার্ট আর লুঙ্গি পরে। আর ফিরলেন না। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ! কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। ক'দিন পরে এসে বললেন, গয়া গিয়েছিলেন। কারণ কী না হাওড়া গিয়ে দেখেন গয়ার ট্রেন ছাড়ছে। ট্রেন যখন ছাড়ছে, গয়া না যাওয়ার কোনও মানে হয়? অকাট্য যুক্তি। এরকমই নানা রংচঙে কাণ্ডে ভরপুর ছিল তাঁর জীবন। তুতুল ছাড়াও ছোট মহাশ্বেতার জীবনও চিকমিক করছে বইটি জুড়ে। কীভাবে আরব্যোপন্যাস পড়ে তার মাথায় ভূত চেপেছিল অনন্ত যৌবন চাই। তারপর কচু খেয়ে গলা ফুলে ঢোল হয়ে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল, এরকম মজাদার ঘটনার কথা শুনেছ কখনও? এখন যে পৃথিবীটা দেখছে এই সময়ের ছোটরা, তাদের কাছে এই গল্পগুলো যেন সত্যি জীবন নয়, স্বপ্নের টুকরো। ভারী মিষ্টি সজীবতার ছোঁয়া এনে দেবে মনে। এখানে রয়েছে মহাশ্বেতাদেবীর ঘটক পরিবার ছাড়াও রবীন্দ্রনাথসহ কত না গুণী মানুষের উল্লেখ, অজানা গল্পের ভাঁড়ার। হৃদয়ের খোরাক যেমন পাবে, জ্ঞান বৃদ্ধিও হবে তেমনি।

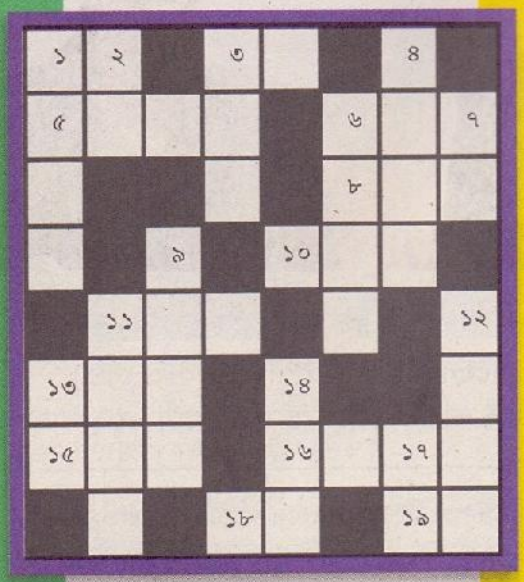

পা শা পা শি

১। আগে 'কাঁ' যোগ করলেই হাতে পরার অলংকার।
৩। বছর।
৫। লাল রঙের জবা।
৬। 'তুমি যদি থাক মনে ___কমলাসনে...' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। জাঁকপূর্ণ।
১০। ___স কিউব। রং মেলানোর খেলা।
১১। চাল।
১৩। এটি আরতির সময় লাগে।
১৫। রচনা করব।
১৬। গর্বিতা।
১৮। ধান থেকে যা হয়।
১৯। দড়ি। রজ্জু।

উপর-নীচ

১। হাতের তালু।
২। রাত।
৩। ত্বক পরিষ্কার করতে প্রয়োজন।
৪। কোনও কিছুতে প্রতিফলিত হয়ে আলো বিচ্ছুরিত হওয়া।
৬। মাথার মধ্যে চিন্তারা এরকম করে মাঝেমধ্যে।
৭। ব্ল্যাকবোর্ডে এটি দিয়েই লিখতে হয়।
৯। চিৎকার। রব।
১১। রসের মিষ্টি।
১২। অমাবস্যার রাত।
১৩। মাছকে টোপ দিতে যা লাগে।
১৪। উন্মাদ।
১৭। এর সঙ্গে খন্ডি যোগ করলেই তিলের সঙ্গে গুড় বা চিনি মিশিয়ে প্রস্তুত মিঠাই।

গত সংখ্যার সমাধান

শালুক

নিজের হাতে

মাইক বানিয়ে ইচ্ছেমতো গান করো

উপকরণ: হজমিগুলির শিশি আর একটা নারকেল তেলের শিশি।

কীভাবে করবে: প্রথমে হজমিগুলির একটা শিশি খুঁজে বের করো। শিশিটা ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে কিন্তু। এবার ভাল আঠা দিয়ে তার উপরে নারকেল তেলের শিশিটা বসিয়ে দাও। শুকোতে দাও রোদে। এবার ভাল করে ছবি দেখে রংচং করে দাও। ইচ্ছেমতোও করতে পার। দ্যাখো, এবার বেশ মাইকের মতোই লাগছে না? গলা ছেড়ে গান গাও।

গুরুপ্রসাদ দে
ফোটো: প্রদীপ আদক

কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদের সঙ্গে

দেখিয়ে দিলেন সিন্ধু

অনেকের মুখ বন্ধ করে, অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন রিওতে রুপোজয়ী পিভি সিন্ধু। তাঁরই কাহিনি লিখেছেন **ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়**

পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু। সংক্ষেপে, পি ভি সিন্ধু। রিও অলিম্পিক্সে রুপো জয়ের পর এই নাম মুখে-মুখে। বিরাট অঙ্কের অর্থ, দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি, চাকরিতে পদোন্নতি, খেলাধুলোয় ভারতের সর্বোচ্চ পুরস্কার... সব এসে পড়ছে সিন্ধুর পুরস্কারের ঝুলিতে। সত্যিই তো, যেভাবে আপামর ভারতবাসীকে তিনি অলিম্পিক্স ফাইনালের সন্ধ্যায় টিভির সামনে জড়ো করতে পেরেছিলেন, সেই আবেগ ক্রিকেট ছাড়া কখনও দেখা গিয়েছে কি? এমনিতে আমাদের দেশে পাড়ায় খেলা মানেই ছেলেদের ক্রিকেট আর মেয়েদের ব্যাডমিন্টন। কিন্তু সেখান থেকে এই উচ্চতা তো ভাবা যায় না! অবশ্য সেরকম কত কিছুই তো সিন্ধুর ব্যাপারে ভাবেননি অনেকে। একদিন এই সিন্ধুকেই শুনতে হয়েছিল, এমন যখন উচ্চতা (৫ ফুট ১১ ইঞ্চি), মডেলিং করতে গেলেই পারে! খেলাধুলোই যদি করতে হয়, ভলিবল খেলুক! বাবা পি ভি রমানা অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ভলিবল খেলোয়াড়। মা-ও ভলিবলে চৌকস ছিলেন! এমনকী, এই ক'দিন আগেও বলা হয়েছিল, সাইনা নেহওয়াল যখন আছেন, সিন্ধুকে কী দরকার?

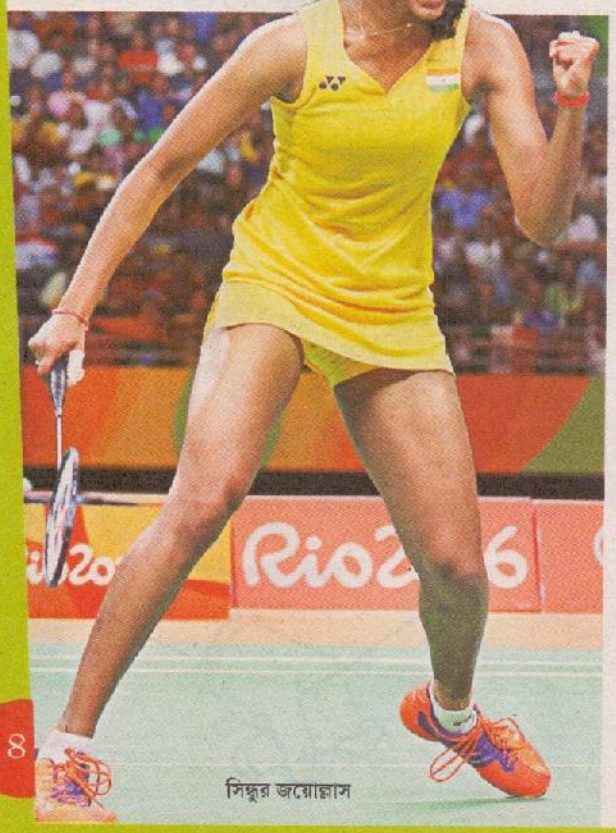

সিন্ধুর জয়োল্লাস

আসলে সিন্ধু কখনওই এসবে বিশেষ পাত্তা দেন না। সিন্ধুর বয়স যখন মাত্র ছয়, সেই সময়ই পুল্লেলা গোপীচন্দ অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট জিতলেন। আর র‍্যাকেট হাতে নিয়ে ভলিবল-বাড়ির মেয়ে ঠিক করে ফেলল, সে ব্যাডমিন্টন খেলবে। সেকেন্দরাবাদের একটি আকাদেমিতে শিক্ষা শুরু করে, কয়েকদিনের মধ্যেই স্বয়ং নিজের আদর্শ গোপীচন্দের আকাদেমিতেই ভর্তি হয়ে গেল সিন্ধু! জান, সিন্ধুর বাড়ি থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই আকাদেমি। ট্রেনিং শুরু হয় ভোর চারটেয়। বুঝতেই পারছ কী প্রচণ্ড অনুশাসন ওই বয়সেই সিন্ধুর জীবনে ঢুকে পড়েছিল! আসলে এই অনুশাসন আর জেদই সিন্ধুর পাথেয়। এই তো সেদিন ফেব্রুয়ারি মাসে, সাউথ-এশিয়ান গেম্সের ফাইনালে হেরেছেন সিন্ধু। অলিম্পিক্সের আগে একটা সময় পা-ও ভেঙে গিয়েছিল! সেখান থেকে অলিম্পিক রুপোজয় হল কী করে? ওই যে জেদ! ওই ভাঙা পা নিয়েই টানা ট্রেনিং করেছেন সিন্ধু। সকাল চারটে থেকে সাত ঘণ্টা টানা ট্রেনিং, মাত্র দু'বার ১৫ মিনিটের স্ন্যাক ব্রেক! কোচের ভূমিকাও অনেকটা। তিনিই বিভিন্ন ধরনের স্ম্যাশ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, কোনটা সিন্ধুর জন্য ঠিক। আসলে লম্বা হলে যেমন দূরে পৌঁছনোর সুবিধে, তেমনই স্ম্যাশের ক্ষেত্রে খুব অসুবিধে। সিন্ধুকে আরও শেখানো হয়েছিল, উত্তেজনা কমিয়ে মাথা ঠান্ডা রাখা। এতেই ওই আমূল পরিবর্তন! বরফ-ঠান্ডা মাথা নিয়ে, তাবড়-তাবড় খেলোয়াড়দের হারিয়ে, ফাইনালে উঠলেন প্রথম কোনও ভারতীয় মহিলা। বিশ্বের এক নম্বর ক্যারোলিনা মারিনের বিরুদ্ধে দশ নম্বর সিন্ধুর লড়াইটা কঠিন হলেও, সিন্ধু কিন্তু ছেড়ে দেননি। পিছিয়ে থেকেও প্রথম সেট জিতে নিয়েছিলেন। শেষ সেটেও একটা সময় সমান-সমান করে ফেলেছিলেন। শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি। কিন্তু এই বয়সেই যা হয়েছে, তা কম কী? আর কোচ পুল্লেলা গোপীচন্দ্র এবং সিন্ধুর ফিজিওর বক্তব্য, আরও ২০ শতাংশ উন্নতি করবেন তিনি। পরবর্তী লক্ষ্য, বিশ্বের এক নম্বর জায়গা। এবং পরের অলিম্পিক্সে সোনা। সিন্ধু কিন্তু দেখিয়ে দিলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়!

জাতীয় পতাকার মর্যাদা রেখেছেন সাক্ষী

ইতিহাসের 'সাক্ষী'

সাক্ষী মালিক, ভারতের প্রথম অলিম্পিক্স পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগীর। তাঁর জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার গল্প শোনাচ্ছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

কুস্তির পীঠস্থান হরিয়ানা। যেখানে প্রতি ১০০০ জন পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা মাত্র ৮৭১! স্কুলের গণ্ডি পেরনো মাত্রই মেয়েদের 'বিয়ে দিয়ে দেওয়া'-ই সেখানকার রীতি। সেই রাজ্যেরই রোহতক জেলার মোরখা খাস গ্রামের মেয়ে সাক্ষী মালিক, যার হাত ধরে ২০১৬-এর রিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ মেডেল এল ভারতের ঝুলিতে। রেসলিংয়ে ভারতের প্রথম মহিলা অলিম্পিক্স পদকজয়ী। তবে এই পদকজয়ের রাস্তাটা মসৃণ ছিল না মোটেই। ঠাকুরদা বাধলু রামের সঙ্গে আখড়ায় গিয়েই ছোটবেলা থেকে কুস্তি লড়ার ইচ্ছে হয় সাক্ষীর। বাবা সুখবীর বাস কন্ডাক্টর এবং মা সুদেশ স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তবে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও মেয়ের স্বপ্নের পথে বাধা আসতে দেননি তাঁরা। মাত্র ১২ বছর বয়সে ঈশ্বর দাহিয়ার কাছে ফ্রিস্টাইল রেসলিংয়ের কোচিং নিতে শুরু করেন। বলাই বাহুল্য, 'ছেলেদের খেলা' বেছে নেওয়ার জন্য সাক্ষী এবং তাঁর কোচকে স্থানীয় মাতব্বরদের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। মাত্র দু'বছরের ট্রেনিংয়ের পরই ২০০৬ সালে সাব-জুনিয়র স্তরে জাতীয় পদকজয় করেন সাক্ষী। সাক্ষীর প্রতিভা দেখে কোচ দাহিয়া রেসলিং ফেডারেশনকে অনুরোধ করেন সিনিয়রদের জাতীয় ক্যাম্পে সাক্ষীর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সেই অনুরোধ রাখেনি কেউ। অবশেষে বিখ্যাত রেসলিং কোচ মহাবীর ফোগতের কন্যা গীতা ফোগতের ট্রেনিং পার্টনার হিসেবে জাতীয় ক্যাম্পে প্রবেশাধিকার মেলে। সেই থেকে ফোগতকন্যাদের ছায়া হিসেবেই সাক্ষীকে সকলে চিনত। তবে শুধু ছায়া হয়ে থাকতে যে সাক্ষী আসেননি, তার প্রমাণ মেলে ২০১০-এ আন্তর্জাতিক জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ মেডেল জেতার পর। পদকজয়ের ধারা বজায় রেখে ২০১৪-তে ডেভ শুল্জ্ ইন্টারন্যাশনাল রেসলিং টুর্নামেন্টে সোনা, কমনওয়েলথ গেমসে রুপো এবং এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জও উঠে আসে সাক্ষীর ট্রোফি ক্যাবিনেটে। তবে অলিম্পিক্সের মঞ্চের প্রতিযোগিতা, আবেগ সবই যে আলাদা! কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়ার ভ্যালেরিয়া কবলোভার কাছে পরাজয়ের পরেও সাক্ষী হাল ছাড়েননি। আর ফলস্বরূপ পে-অফে কিরগিজস্তানের তাইনিবেকোভাকে ৮-৫-এ হারিয়ে ব্রোঞ্জজয়। তাইনিবেকোভার অসাধারণ মারপ্যাঁচে শেষ আট সেকেন্ড পর্যন্ত পিছিয়ে থাকলেও সাক্ষী ম্যাচটি জিতে নেন তিন পয়েন্টে! সেই সুবাদে তাঁর হাত ধরেই আসে কুস্তিতে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম পদক। হোক না তা ব্রোঞ্জ! ভাবতে অবাক লাগলেও, গ্রামের যে মাতব্বরেরা একসময় সাক্ষীর কুস্তি লড়ার পথে ছড়িয়েছিলেন কাঁটা, তাঁরাই আজ প্রশংসা এবং উপহারে ভরিয়ে দিচ্ছেন তাঁকে। এমনকী, হরিয়ানার 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' ক্যাম্পেনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও সাক্ষীই। সাক্ষী কিন্তু ছোটবেলায় অন্য একটি কারণে রেসলার হতে চেয়েছিলেন। না, কোনও আন্তর্জাতিক মেডেলজয়ের মোহ নয়, তাঁর স্বপ্ন ছিল এরোপ্লেনে চড়ে ঘোরার! সেই সাক্ষী আজ দেশের মহিলাদের অনুপ্রেরণা। রোহতকের রেসলিং আকাদেমির নিয়ম ছিল, সাক্ষী কোনও মেডেল জিতলে প্রথমে সেখানকার ছেলেদের সঙ্গে মিষ্টি খেয়ে উদ্‌যাপন করতেন। অলিম্পিক পদকজয়ের পরও সাক্ষীর সেলিব্রেশনের সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

বাবা সুখবীরের সঙ্গে সাক্ষী

ছোট ছোট খেলা

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

সোনার মেয়ে মণিকা

এক সময় টেনিস কোর্ট মাতিয়েছেন মণিকা সেলেস। এবার টেনিসে উঠে এলেন আর-এক মণিকা। ইনি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট দেশ পুয়ের্তো রিকোর মণিকা পুইগ। রিও অলিম্পিকসে মেয়েদের টেনিসে, সিঙ্গলসে সোনা জিতে সাড়া ফেলেছেন তিনি। ফাইনালে হারিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের দু' নম্বর জার্মানির অ্যাঞ্জেলিক কের্বারকে। এখনও পর্যন্ত কোনও গ্র্যান্ড স্লামের কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠতে পারেননি। বড় সাফল্য ২০০৪ সালে ডাবলিউ টি এ টুরে একটি মাত্র সিঙ্গলস খেতাব জয়। অবাছাই খেলোয়াড় হিসেবে অলিম্পিক্স সোনা জিতে হঠাৎই শিরোনামে মণিকা। তাঁর হাত ধরেই অলিম্পিক্সে প্রথম সোনা পেল পুয়ের্তো রিকো। দেশের জন্য সোনা জিতেছেন। সোনাটি তাই দেশের মানুষকেই উৎসর্গ করেছেন মণিকা।

নজির গড়লেন স্টার্ক

একদিনের ক্রিকেটে নতুন নজির গড়ে ফেললেন অস্ট্রেলিয় পেসার মিচেল স্টার্ক। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ় হেরে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়েছে অস্ট্রেলিয়া। তবে ওয়ানডে সিরিজ়ের প্রথম ম্যাচেই জয় পান অজ়ি ক্রিকেটাররা। কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে ৩২ রানে শ্রীলঙ্কার তিন উইকেট তুলে নিয়ে ২৬ বছরের স্টার্ক ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে কম

৫২টি ম্যাচ খেলে দ্রুততম ১০০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েছেন। তাঁর আগে এতদিন এই কৃতিত্ব ছিল পাক স্পিনার (৫৩ ম্যাচ) সাকলাইন মুস্তাকের দখলে। ২০১০ সালে বিশাখাপত্তনমে ভারতের বিরুদ্ধে স্টার্কের একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক। প্রথম ৫০ উইকেট ২৯ ম্যাচে পেলেও পরের ৫০ উইকেট তুলে নেন মাত্র ২৩ ম্যাচে।

অমলের নামে ট্রোফি

ফুটবল খেললেও কোচ হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অমল দত্ত। সদ্য প্রয়াত এই ডায়মন্ড কোচের নামে ট্রোফি চালু করল আই এফ এ। ছয়ের দশকে নিজের খরচে ইংল্যান্ড থেকে ফুটবলে এফ এ কোচিং ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে কোচিংকেই পেশা করে নিয়েছিলেন তিনি। ছেড়েছিলেন রেলের চাকরি। দেশের বহু তারকা ফুটবলার তাঁর হাতে তৈরি। শুরু হয়ে গিয়েছে চলতি মরসুমের কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগ। চ্যাম্পিয়ন টিমের ট্রোফির সঙ্গে এবার থেকে লিগের সেরা কোচের হাতে তুলে দেওয়া হবে অমলের নামাঙ্কিত ট্রোফি।

লাফ থামালেন ইলিনা

পোল নিয়ে আর আকাশ ছোঁয়া লাফ দিতে দেখা যাবে না তাঁকে। পোলভল্ট থেকে অবসর নিয়ে নিলেন রাশিয়ান গ্ল্যামার গার্ল ইলিনা ইসিনবায়েভা। ২০০৪ সালের আথেন্সে এবং ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিক্সে পরপর সোনা জিতে সাড়া জাগিয়েছিলেন ইলিনা। স্বপ্ন ছিল ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক্সে সোনা জিতে হ্যাটট্রিক করবেন। কিন্তু জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ। বহু রেকর্ড ভেঙেছেন আবার গড়েছেন। নতুন করে স্বপ্ন দেখেছিলেন রিও অলিম্পিক্সে সোনা জিতে অবসর নেবেন। কিন্তু হয়নি। ডোপ করার দায়ে রাশিয়ার ৬৭ জন অ্যাথলিট নির্বাসিত হওয়ায় রিওতে নামতে পারেননি ইলিনাও। তাই কতকটা দুঃখ আর হতাশায় খেলোয়াড় জীবনে দাঁড়ি টেনে দিলেন তিনি।

ম্যান ইউতে পোগবা

চার বছর পর আবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে ফিরলেন ফরাসি মিডফিল্ডার পল পোগবা। ইতালির ক্লাব জুভেন্তাস থেকে এবার রেকর্ড পরিমাণ অর্থে তাঁকে নিল ম্যান ইউ। নতুন কোচ জোসে মোরিনহো চাইছিলেন পোগবা দলে আসুক। রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে কতকটা লড়াই করেই ২৩ বছরের এই ফরাসি তারকাকে তুলে এনেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। একেবারে রেকর্ড পরিমাণ দশ কোটি পাউন্ডের বিনিময়ে। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া লিগ ই পি এল-এ নেমে পড়েছেন তিনি। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের সময় ঠিকমতো সুযোগ না পাওয়ায় দল ছেড়েছিলেন পোগবা। চলে গিয়েছিলে জুভেন্তাসে। ফ্রান্সে ইউরো কাপের সময়ই শোনা যাচ্ছিল পোগবা জুভেন্তাস ছেড়ে রিয়ালে পা বাড়াচ্ছেন। ইতালি ছেড়ে তিনি স্পেনের ক্লাবে খেলবেন। কিন্তু পরে সব হিসেবই বদলে যায়। গ্যারেথ বেল (আট কোটি ছ' লাখ পাউন্ড), ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর (আট কোটি পাউন্ড) মতো তারকাদের পিছনে ফেলে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ নিয়ে এবার মরিনহোর বড় অস্ত্র হতে চলেছেন পোগবা।

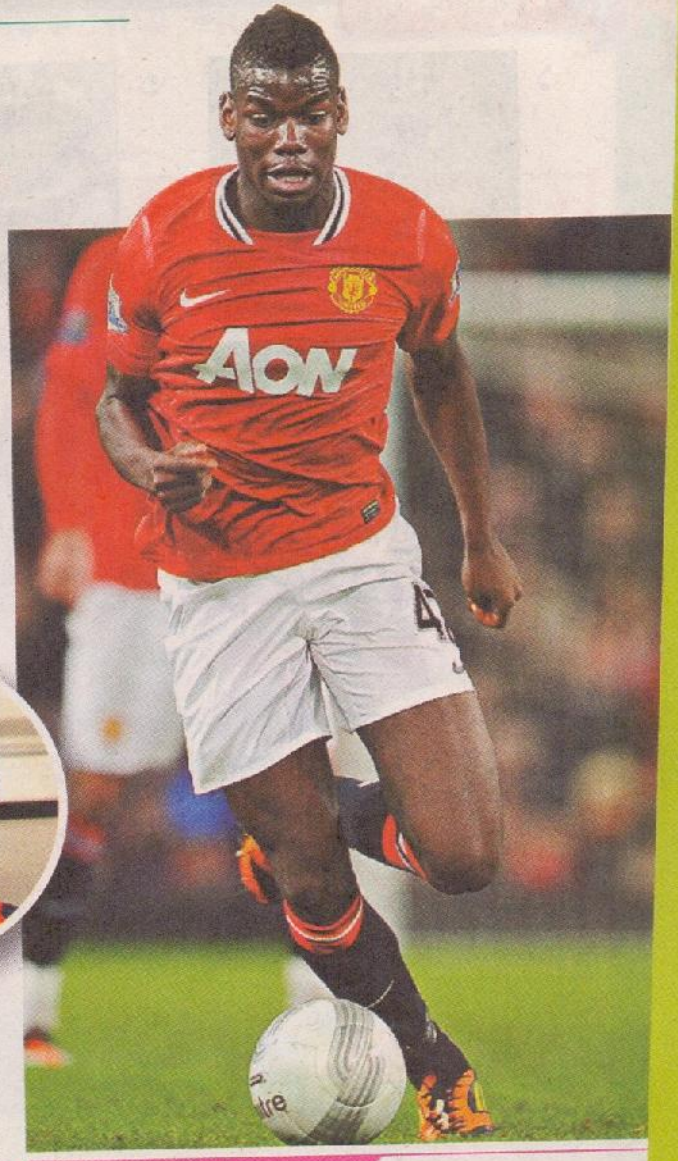

গোপীকে নিয়ে বায়োপিক

কোচ পুল্লেলা গোপীচন্দের জীবন নিয়ে এবার তৈরি হচ্ছে ছবি। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেহওয়ালের ব্রোঞ্জ জয়ের পর এবার রিও অলিম্পিক্সে তাঁরই আর-এক ছাত্রী পি ভি সিন্ধু রুপো জিতে ইতিহাস গড়েছেন। প্রকাশ পাড়ুকোনের পর গোপীই দেশের একমাত্র তারকা যিনি অল ইংল্যান্ড খেতাব জিতেছেন। তাঁর হায়দরাবাদের ব্যাডমিন্টন আকাদেমি এখন দেশের সেরা। কোচ গোপীর জীবন নিয়ে সেলুলয়েডে ছবি বানাতে চলেছেন প্রযোজক অভিষেক নামা। গোপীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন তাঁরই এক সময়ের সঙ্গী খেলোয়াড় সুধীরবাবু।

সাফল্যে এল বৃত্তি

বাংলার চার প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে সংবর্ধিত করল কলকাতা ময়দানের ডালহৌসি অ্যাথলেটিক ক্লাব। ক্লাবের ১৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে অ্যাথলিট লিলি দাস, জিমন্যাস্ট বিদিশা গায়েন, সাঁতারু মৌপ্রিয়া মিত্র ও শুটার আয়ুষি পোদ্দারকে মাসিক দু' হাজার টাকা করে এক বছরের জন্য বৃত্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। ত্রিবেণীর গরিব ঘরের মেয়ে লিলি ভিয়েতনামে এশিয়ান জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতছেন। জাতীয় জিমন্যাস্টিক্সে নজর কেড়েছেন জয়নগরের মেয়ে বিদিশা। হুগলির সাঁতারু মৌপ্রিয়া ডাইভিংয়ে সোনা জিতছেন। শুটিংয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের সাফল্য পাচ্ছেন আয়ুষি। রঞ্জনা সেন, বি ও এ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব চন্দন রায়চৌধুরী প্রমুখ খেলোয়াড়দের হাতে ট্রোফি ও বৃত্তির অর্থ তুলে দেন।

চন্দন রুদ্র

১

৩

২

৪

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পরপর খোপে লিখে ফ্যালো। এবার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। চারটি জিনিসের নাম পাশাপাশি বাংলায় লিখে ফ্যালো, যাতে ওই বিশেষ জিনিসটির নাম উপর-নীচ করে পড়া যায়। পেয়েছ খুঁজে?

এবারের সঙ্কেত: এখানেই কণ্বমুনির স্নেহের ছায়ায় শকুন্তলা বড় হয়েছিলেন।

১			
২			
৩			
৪			

স	ও	য়া	র
না	র	কে	ল
ত	থা	গ	ত
ন	থি	প	ত্র

৫ অগস্ট সংখ্যার সমাধান:

স না ত ন

÷ × + −

Go Figure

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

সহজ

							= ৩
৫		৭		৮		১৬	

মাঝামাঝি

							= ১৩
৪		৬		১৫		১৮	

কঠিন

							= ৩৯
১		৫		১৩		১৫	

৫ অগস্ট সংখ্যার সমাধান:

সহজ: (৮×১২) ÷৬-১৫ = ১

মাঝামাঝি: (১৬ ×৩ -৪)÷১১= ৪

কঠিন: (১৯+১০) -(২×৬) = ১৭

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

আদিত্য মিত্র, *তৃতীয় শ্রেণি, হুগলি ব্রাঞ্চ (গভঃ) স্কুল, হুগলি।* **শুভান্বিতা চক্রবর্তী**, *চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।* **অগ্নিভ দাশগুপ্ত**, *পঞ্চম শ্রেণি, খসমরা উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া।* **অভিনন্দন নাথ**, *পঞ্চম শ্রেণি, ক্যানিং রায়বাঘিনী হাই স্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।* **সম্বিত সাহা**, *অষ্টম শ্রেণি, বেথানী স্কুল, সুলন্টু, পারুলিয়া, বর্ধমান।* **নীলকান্ত পাল**, *সপ্তম শ্রেণি, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, কৃষ্ণনগর, নদিয়া।* **শ্রেয়া দাস**, *অষ্টম শ্রেণি, অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক), পশ্চিম মেদিনীপুর।* **সৃজন মাইতি**, *পঞ্চম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।*

An Allen PRODUCT

শীতে বডি অয়েল তো সবাই মাখে

আমি মাখি

অলিভঅ্যালেন

হার্বাল বডি অয়েল*

Dr. Sarkar's AllenAyur HERBALS

অলিভঅ্যালেন

বডি অয়েল

*Ayurvedic Proprietary Medicine, Not Cosmetic

Dr. G. P. Sarkar
Founder Chairman
Allen Group of Companies

শীতে ত্বকের রুক্ষতা, শুষ্কতা, খড়ি ওঠা, র‍্যাশ ও ফুসকুড়ির মত সমস্যায় আপনার চাই ইম্পোর্টেড ইটালিয়ান অলিভ অয়েল ও ভারতীয় আয়ুর্বেদের অনন্য গুণসমৃদ্ধ উপাদান- হরিদ্রা, অর্জুন, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, নিম এবং স্যান্ডালউড অয়েল যুক্ত ডাঃ সরকার অ্যালেন ইনস্টিটিউট আবিষ্কৃত **অলিভঅ্যালেন**। তাই আজই শুরু করুন **অলিভঅ্যালেন**-এর ব্যবহার যাতে আপনার ত্বক হয়ে উঠবে কোমল, মসৃণ ও লাবণ্যময়। **অলিভঅ্যালেন** প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ বডি অয়েল।

তাক লাগানো ত্বকের শুরু তো এখানেই!!

Allen A quality product from the house of LIVOSIN
মেডিকেল হেল্পলাইন (টোল ফ্রি) ঃ ১৮০০-৩৪৫-২২১০

সমস্ত জেনারেল ও মেডিকেল স্টোরস্-এ পাওয়া যায়।
Also available in - flipkart.com FRANK ROSS PHARMACY Apollo PHARMACY

ANANDAMELA 5 SEPTEMBER 2016 REGISTERED KOL RMS/236/2016-2018,RNI NO.27057/75 INR 20.00

আরে আরে, এ তো আমার ই আবিষ্কার-
সানরাইজ-এর সর্ষে পাউডার

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

একটু জল, এক চিমটে নুন
দিয়ে পেষ্ট বানিয়ে ১০ মিনিট
রাখুন। ব্যস্, আপনার
সর্ষে পেষ্ট রেডী।
ঠিক যেন বাড়ীতে বাটা।

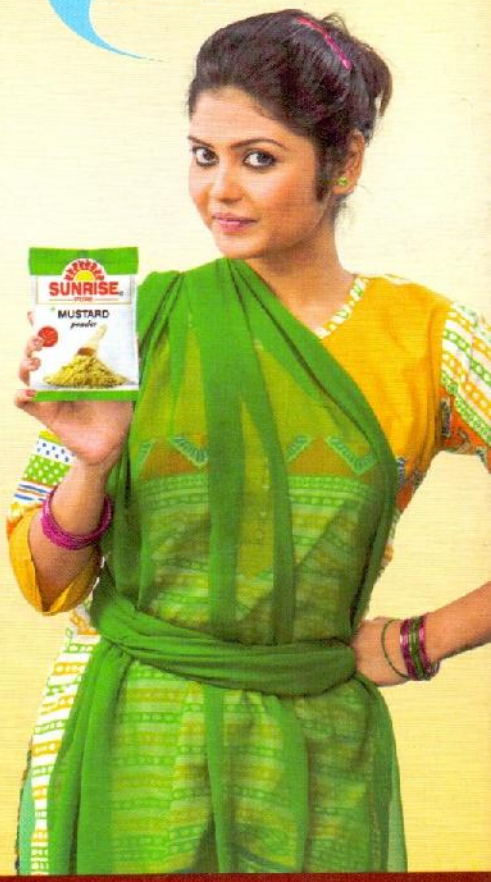

SUNRISE®
PURE

NO বাটাবাটি... ঝাঁঝ ফাটাফাটি...